Alpo Kothar Golpo by Wasim Haque

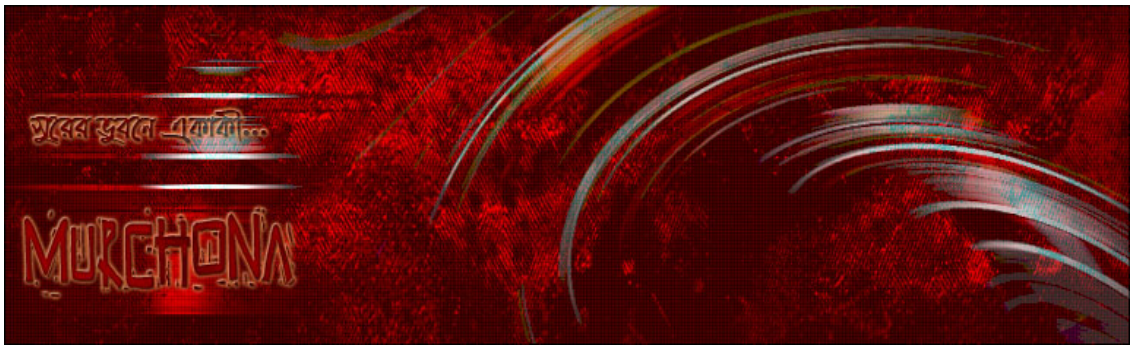

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.MurchOna.com/forum

অল্প কথার গল্প

ওয়াসীম হক

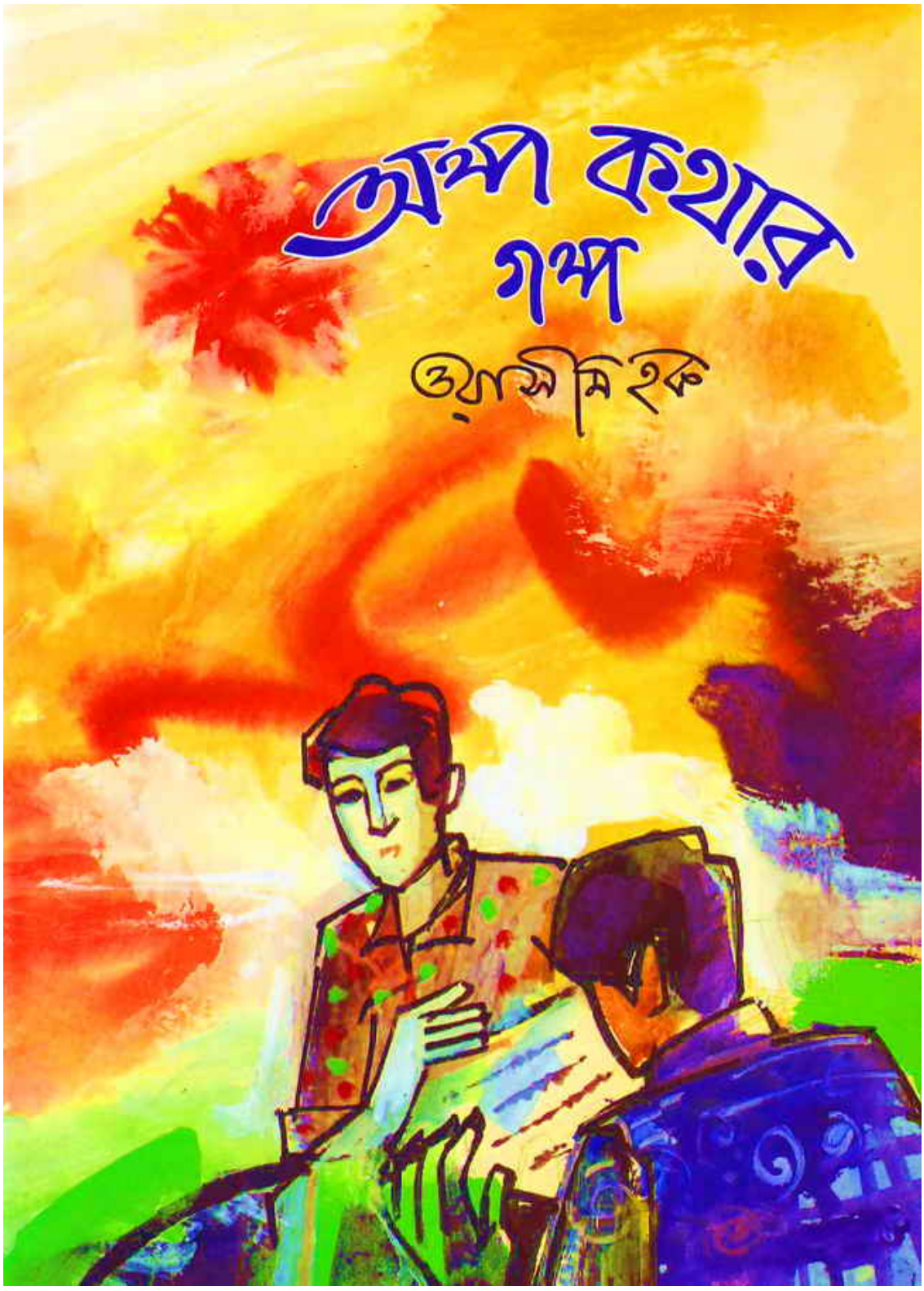

"কোঁচড় ভরা ফুলের কুঁড়ি
আকাশ জুড়ে রঙিন ঘুড়ি
মাঞ্জা সুতো বাঁশের নাটাই
মেঘের কাছে পত্র পাঠাই"

হ্যাঁ, এই হলেন তরুণ শব্দপ্রেমিক ওয়াসীম হক। শান্ত পুকুরের শীতল জলে ঢিল ছুড়ে যার অবাধ শব্দ সাঁতার। কথাশিল্পী ওয়াসীম হক কখনও নীলাকাশে পাখির ডানায় ভর করে কখনও সাগরের নীল জলে মিলে মিশে একাকার হয়ে খুঁজছেন বর্ণমালার মুক্তোমাণিক।

দেশ, জাতি, পতাকাকে ভালোবেসে তাঁর কলম আনন্দের শান বাঁধানো ঘাট, ভরা ফসলের মাঠ, শিশুর মুখে ঘ্রাণ, দোয়েল শ্যামার গান। ২০০২ এ প্রথম ছড়াগ্রন্থ 'আমার ছড়া নয়তো কড়া' একুশের বইমেলায় প্রকাশিত হবার পর দেশ বিদেশে প্রাণহরা অভিনন্দিত হয়। ভাষা শৈলীর অনন্য সুরে ঝংকৃত হন পাঠককুল।

দীর্ঘ দেড় দশক ধরে সজ্জন ব্যাক্তিত্বের অধিকারী, মানুষের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ ওয়াসীম হক সাহিত্যের পৃথিবীতে অসামান্য স্বাক্ষর রেখে এগিয়ে চলছেন আগামীর আমন্ত্রণে। দ্বিতীয় ছড়ার বই 'সাতরঙা সেই দিন' ২০০৫ এ প্রকাশিত হবার পর বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, ভাষাসৈনিকগণ তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসায় মৌখিক ও লিখিতভাবে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। বিশেষ করে শিশু কিশোর পাঠকদের অনুরোধে ওয়াসীম হক

যাদের রক্তে ভিজে আছে
এদেশের সবুজ মাটি
সেই সব বীর শহীদ স্মরণে

সূচিপত্র

বনির জীবন ৫
গুণীর কদর ১০
হারজিত ১৭
সুমন নামের সাহসী ছেলেটি ২১

বনির জীবন

কম্পিউটার মনিটর এর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বনি। একটু আগে শুরু করা গেমসটা খেলতে আর মোটেই ভালো লাগছে না। অথচ সাদিবের কাছ থেকে কত কষ্ট করে চেয়ে এনেছিল কমান্ডোজ এর সিডি। সাদিবটার যা নাক উঁচু স্বভাব, কিছু চাইলেই বলে, তোর কাছে সিডি দিলেই তো একশটা স্ক্র্যাচ ফেলে দিবি। তখন তো আমার সিডি রম এর বারোটা বাজবে। কিন্তু বনি মোটেই এমন নয়। কারো কাছ থেকে কোন জিনিস আনলে তা সে বেশ যত্ন করেই রাখে। তা হোক সিডি বা গল্পের বই। আজ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে বসে কত মজার কথা ভাবছিল বনি। বাসায় ফিরেই হাত মুখ ধুয়ে বসে গেল পি.সি.র সামনে। কিন্তু একটু খেলার পরেই এই অবস্থা। হুট করে মনটা খারাপ হয়ে গেল। হারিয়ে ফেলল খেলার উৎসাহ। তার চোখ মনিটর এর দিকে কিন্তু মন যেন কোথায় চলে গেছে।

বনি সানি ডেল এর ষ্ট্যান্ডার্ড সিক্স এর ছাত্র। তবে ইংরেজী মাধ্যমে পড়ুয়া বেশিরভাগ ছেলে মেয়েদের মতো নয় বনি। তার বাংলা ছড়া, কবিতা, গল্পের বই পড়তে খুব ভালো লাগে। বাংলা গানও তার খুব প্রিয়। ফেব্রুয়ারীতে একুশের বইমেলায় যায় বনি। পছন্দমতো

বই কিনে আনে দু'হাত ভরে। তাই শুনে তাদের ক্লাশ এর ইশমাম এর সে কি হাসি। বলে,
: আরে দূর, এসব বই আবার পড়ার কি আছে? বনি তাই শুনে খুব রেগে গেলো। সে বললো,
: গল্পের বই পড়লে অনেক কিছু জানা যায়। তুমি কি বলতে পারবে ৭১ সনে কি হয়েছিলো। আমরা কিভাবে স্বাধীন হয়েছি ?
: ওই কি যেন একটা হয়েছিল..উমম্ হ্যাঁ মনে পড়েছে, একটা যুদ্ধ আর কি। তা যুদ্ধ তো হর হামেশাই হয়। ইটস নট আ বিগ ডিল।
এ কথা শুনে বনির মতো শান্ত স্বভাবের ছেলেও রাগে ফেটে পড়লো।
: এ্যাবসলিউটলি ইটস আ বিগ ডিল। যদি মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন না করতেন, তাহলে তোমাকে গাড়ী করে স্কুলে আসতে হতো না, ভালো পোশাক আর খাবারও পেতে না। পাকিস্তানীরা কিভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করতো সেটা বই পড়েই জানতে পেরেছি। দেশের জন্য কত মানুষ প্রাণ দিয়েছে, কত কষ্ট করেছে সেটাও আমি বই পড়ে জেনেছি। তখন অন্য বন্ধুরা এসে বনিকে শান্ত করলো।

বনির বাবা আহমেদ ফারুক মস্ত বড় ব্যবসায়ী। মানুষ যেমন রিক্সা করে ধানমন্ডি থেকে কলাবাগান যায়, বনির বাবা তেমন ব্যাংকক সিঙ্গাপুর যান। এত বড় ব্যবসা তার, যেতে তো হবেই। মা যেন আর এক কাঠি বেশী ব্যস্ত। কত্ত রকম সংগঠনের সাথে তার নাম জড়ানো। আজ লেডিস ক্লাব, কাল ফ্লাওয়ার ফ্যাস্টিভ্যাল, পরশু ডগ শো। তার ব্যস্ততার কথা বলে শেষ করা যাবে না। বনির ভাই বোন নেই। মাঝে মাঝে বড্ড একলা মনে হয় নিজেকে। আসলে একটা ভাই বা বোন থাকলে কত্ত মজা হতো। যদিও সেদিন তাদের ক্লাস এর মিতু বলছিলো,
: কি মজা তোর বনি, ভাই বোন নেই, যা ইচ্ছে তাই করতে পারিস। কেউ কোন কাজে বাঁধা দেয় না। আর আমাকে দেখ, সব কিছুতেই ভাইয়ার মাতব্বরি। মাত্র দু ক্লাস উপরে পড়ে, কিন্তু ভাবখানা এমন, যেন আমার কত্ত বড়। মিতু, এখন টিভি দেখবে না, আমার পি.সি. ধরার আগে আমাকে বলবে, কি ব্যাপার এই ঠান্ডার মাঝে খালি পায়ে ঘুরছো কেন ? আম্মুকে কিছু বললেই বলে, ঠিকই তো বলেছে, আর বড়দের কথা শুনতে হয়। ইস্‌সিরে, কত বড় মানুষ যেন এসছেন। মাঝে মাঝে এমন রাগ হয় না, তোকে কি বলব। আহা, তোর কত্ত মজা বনি।

মিতুর কথাগুলো শুনে বনির একটুও ভালো লাগে না। একলা থাকার যে কি কষ্ট তা সে বেশ বুঝতে পারে। ভাই বোনের সাথে একটু আধটু ঝগড়া, হইচই, মজা করে গল্প করা এর মাঝে কত আনন্দ লুকিয়ে আছে। এমনিতে বনি ভারী লক্ষী ছেলে। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ

নেই। মন দিয়ে পড়ালেখা করে। আব্বু আম্মুর কথা শোনে। কিন্তু এই লক্ষী ছেলেটারও মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহ করে। করবে নাই বা কেন ? একঘেয়ে জীবন কারই ভালো লাগে। সকালে ঘুম ঘুম চোখে বিছানা ছাড়তে হয়। নাস্তার টেবিলে কর্ণফ্লেক্স, জেলি মেশানো পাউরুটি, দুধ আর ডিম পোচের অসহ্য নাস্তা। অনেক কষ্টে শেষ করতে না করতেই স্কুলে যাবার তাড়া। টানা তিন পিরিয়ড এর পর আধ ঘন্টা ব্রেক। সেই ফাঁকে টিফিন। টিফিনেও তো গৎবাধা নুডুলস নয়তো ডিম পাউরুটি টোষ্ট। বনির মামাতো ভাই আসিফ যে স্কুলে পড়ে, সেখানে নাকি অনেক মজার খাবার পাওয়া যায় টিফিনের সময়। আচার, আইসক্রীম, পেয়ারা, আমড়া, ঝালমুড়ি। আম্মুকে একদিন এসব কথা বলতেই তিনি রেগে লাল।
: ছিঃ বনি, তুমি জান না এসব খোলা খাবার খেলে অসুখ করে। তারচেয়ে বুশনী বুয়াকে সকালবেলা বলবে, তোমার জন্য স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিতে। ইস, বনির বয়েই গেছে খেতে। এসব ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ব্রেক এর পর মাঝে মাঝে খুব ক্লান্তি লাগে পিরিয়ড গুলো। বাসায় ফিরে গোসল করে দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম। সন্ধ্যা হতে না হতেই শারমীন ম্যাম আসেন। আগের দিনের দেয়া হোমওয়ার্ক গুলো ঠিকমতো হয়েছে কি না দেখেন। তারপর এক এক করে তিনটা সাবজেক্ট পড়ান। তবে এই ম্যামটাকে বনির বেশ ভালো লাগে। মাঝে মাঝে বনির জন্য গিফট নিয়ে আসেন। কোনদিন কিটক্যাট আবার কোনদিন পোকেমন এর ষ্টিকার। কোন কিছু না বুঝলে মিষ্টি করে হেসে বুঝিয়ে দেন। অবশ্য বনির বেশি সময় লাগে না পড়া বুঝে নিতে। শারমীন ম্যাম যেতেই আসেন সুমন স্যার। ওরে বাবা, কি যে কড়া। একটু এদিক সেদিক হতেই দুই কেজি ওজনের একটা ধমক খেতে হয়। তার কথা হলো, শাসনের ভেতর না রাখলে ছেলেপিলে মানুষ হয় না। স্যার যাবার পর বনি নিজের মত করে পড়ে।

ছুটির দিনগুলো নাকি ভারি মজার হয়। কিন্তু তার বেলায় উল্টো। শিশু একাডেমীতে যাও আর্ট শিখতে, বাফাতে যাও গান শিখতে। এটা নাকি কম্পিটিশনের যুগ। সবার আগে আগে থাকতে হবে। তা না হলে সোসাইটিতে বনির বাবা মা গর্ব করে বলবেন কিভাবে, আমার ছেলের আঁকার হাত যা সুন্দর, এইবার ফার্ষ্ট হয়েছে। গানের গলাও চমৎকার। নিজের ছেলে বলে বলছি না, সত্যি কথা। ও আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে একদিন। বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে যেয়ে বনির শৈশবের সোনালী দিনগুলো যে কর্পূরের মতো উড়ে যাচ্ছে সে কথা কি কেউ একটুও ভাবে না ?

রাতের বেলায় খাবার টেবিলে আব্বু নাকের ওপর চশমাটা একটু ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, বনি, সব ঠিকমতো চলছে তো? বনি বাধ্য ছেলের মতো মাথা কাত করে বলে, হ্যাঁ আব্বু।

তিনি তখন বলেন বেশ বেশ,দেখতে হবে তো, কার ছেলে। আম্মু মুচকি হেসে বলেন, হ্যাঁ আমার ছেলে। এই নিয়ে দুজনের মাঝে হালকা হাসি ঠাট্টা হয়। খাওয়া শেষ হতেই আম্মুর কড়া নির্দেশ।

: বনি, দাঁত ব্রাশ করে ঘুমুতে যাও। কিন্তু বললেই কি ঘুম আসে? বনি তখন শুয়ে শুয়ে ভাবে, গাঁয়ের কথা। বনির দাদাবাড়ী। ছোটবেলা একবার গিয়েছিল। কি যে সুন্দর পরিবেশ। নদী, পালতোলা নৌকা, পাখির ডাক, ঢেউখেলানো ধানের ক্ষেত। আর সেখানে তার বয়েসী বাচ্চাগুলো কি সরল। একটুও অহংকার নেই। নিজ থেকে এসে কথা বলে। আর বনির মুখে ঢাকার গল্প শুনতে চায়। চোখ বড় বড় করে শোনে আর অবাক হয়। বনি ভেবে পায় না, এত সুন্দর গ্রামে যারা থাকে, তাদের ঢাকার কথা শুনে অবাক হবার কি আছে ? ইস, আবার যদি যাওয়া যেতো দাদুর বাড়ি।

মাঝে মাঝে বিকেলবেলা বনি ছাদে যায়। তাও প্রতিদিন ছাদ খোলা থাকে না। এপার্টমেন্ট এর যে কমিটি আছে, তারা নিষেধ করেছেন ছাদ খুলতে। বাচ্চাদের নাকি পড়ে যাবার সম্ভাবনা। কি আজব কথা। ৪ ফিট উঁচু রেলিং টপকে কোন বাচ্চার শখ হয়েছে লাফ দিতে ? কমিটির উপর রাগ করবার আরো কারণ আছে। বনি, রূপম আর আকাশ মিলে কবুতর পালতো ছাদে। প্রথমে কয়েকটা দিয়ে শুরু। তারপর বাড়তে বাড়তে ৩৫ টা হয়েছিল। কি যে সুন্দর লাগত, কবুতরগুলো যখন ঝাঁক বেধে উড়তো নীলাকাশে। আর ছোট বাচ্চাগুলো তো ছিলো আরো কিউট। বনিদের হাত থেকে খাবার খেতো। বেশ আনন্দেই কাটছিলো সময়টা তখন। কিন্তু হঠাৎ করে এপার্টমেন্ট এর বিজ্ঞ (!!!) কমিটি ঘোষণা করলেন এক নোটিশ এর মাধ্যমে " এতদ্বারা ক্রিসেন্ট টাওয়ার এর সকল ফ্ল্যাট মালিকগণকে জানানো যাইতেছে যে, ছাদে কোন প্রকার পাখি বা জীবজন্তু পালা যাইবে না। এতে ছাদের সৌন্দর্য হানি হইতেছে। সেই সাথে ছোট বাচ্চাদের ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণহানির আশংকাও রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আপনাদের সকলের প্রতি অনুরোধ, নিজ নিজ ছেলেমেয়েদেরকে ছাদে যাইতে এবং কোন প্রকার জীব জন্তু পালন করিতে নিরুৎসাহিত করুন।" অদ্ভুত ভাষার এই পঁচা চিঠিটা পড়তে গিয়ে বনির কান্না পাচ্ছিল। কি যে কষ্টই না লাগলো যেদিন ড্রাইভার চাচা সব কবুতর নিয়ে বিক্রি করে দিয়ে এলেন কবুতরের বাজারে। বনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। আম্মু এসে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিলেন তাকে। এই কমিটি যেন বনিদের পেছনে লেগেই আছে সারাক্ষণ। তারা দোতলায় খেলবার জায়গায় ক্রিকেট খেলতো। সেটাও বন্ধ করে দেয়া হলো। কোনরকম ইনডোর গেমস এরও ব্যবস্থা নেই। বনিদের অবসর টা তাহলে কাটে কিভাবে ?

এসব কথা ভাবতে ভাবতে বনি চলে গেল দাদাবাড়ি। ওইতো ছোট্ট নদী। নদীর ওপর

পালতোলা নৌকা। মাঝি নৌকা বাইছে আর নিজের মনে গান গাইছে। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে খেলছে মাঠে। ধান ক্ষেতে শিস দিয়ে যাচ্ছে বাতাস। তখন মনে হচ্ছে একটা সবুজ সমুদ্র। কি অপূর্ব দৃশ্য। একটা ছোট্ট মেয়েকে তার বড় ভাই সুপুরি পাতার খোলে বসিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটার মনে রাজ্য জয়ের আনন্দ উপচে পড়ছে তার হাসিতে। আরে একি, ছেলে মেয়েদের খেলা শেষ হতেই সবাই দল বেধে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। সাঁতার কাটতে লাগল মজা করে। কেউ বা আবার ডুব সাঁতার দিয়ে অন্য কারো পা টেনে ধরছে। পানিভুতে ধরেছে ভেবে তার সে কি জোরে চিৎকার। এই না দেখে অন্যদের হাসি থামতেই চায় না। সন্ধ্যা হতে আর বেশি বাকী নেই। কি সুন্দর লাগছে দেখতে, রাখাল একপাল গরু নিয়ে যাচ্ছে। একটা গরু একটু অন্যদিকে গেলেই হ্যাট হ্যাট বলে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। সূর্য ডুববে একটু পরেই। আকাশটা যেন লাল হয়ে আছে। আকাশের লাল রঙ আর গরুদের দল বেধে বাড়ী ফেরার কারণে রাস্তা থেকে যে ধূলো উড়ছে দু'টো মিলে কেমন যেন একটা দৃশ্য। বইয়ে পড়েছে বনি, একে বলে গোধূলি। আজকেই প্রথম দেখা হলো।

দাদাবাড়ির পাশে তালপুকুরের ওপর পুকুরপাড়ের মস্ত আমগাছটার ছায়া পড়েছে। ওমা, একটা মাছরাঙা পাখি ছোঁ মেরে পুকুর থেকে মাছ তুলে উড়ে গিয়ে বসলো সেই গাছের মগডালে। বনির একটু মায়া লাগলো মাছটার জন্য। আবার নিজেকেই সান্ত্বনা দিলো এই বলে, মাছ না ধরলে মাছরাঙা খাবে কি? আহা, কি সব চমৎকার দৃশ্য। সত্যিই, আমার দেশের মত এত সুন্দর দেশ আর কোথাও নেই। এই সুন্দর সময়ে কে যেন মিহি গলায় ডাকাডাকি শুরু করল, ও ভাইয়া, ভাইয়া। ইস, কে যে জ্বালাতে এলো এই সময়ে। আবারো ডাক, ও ভাইয়া, বেলা যে ডুইব্যা গেলো, আযান দিতাছে, আফনের ম্যাডাম আইয়া পড়ব। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া কিছু খান। বনি তাকিয়ে দেখে বুশনি বুয়া। ও, তাহলে এই ব্যাপার। বনি দাদাবাড়ি যেতে পারেনি। এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল? বাস্তবে ফিরে এলো সে এইমাত্র। আবার সেই একঘেয়ে জীবন, সেই রুটিনবাধা সময়। যার একটুও এদিক সেদিক হবার উপায় নেই। ছেলেদের নাকি চোখে পানি আসতে নেই, এটা খুব লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু বনির দু'চোখ বেয়ে যদি পানি উপচে পড়ে, তখন সে কি ই বা করতে পারে ?

গুণীর কদর

বল্টু মামা ইদানীং খুব সমস্যার মধ্যে আছেন। তিনি চান হঠাৎ করে বিখ্যাত হতে। কিন্তু সেটা কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছেনা। তাঁর মাঝে মাঝে মনে হয় যদি দেশের সবাই তাকে একনামে চিনতো, তবে খুব ভালো হতো। রাস্তায় বের হলেই সবাই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতো। তার কাছে অটোগ্রাফ চাইতো। এ কথাগুলো ভেবে তিনি প্রায়ই বেশ রোমাঞ্চিত হন। কিন্তু বাস্তবে তা আর হলো কই ? তিনি প্রথমে চাইলেন কবি হতে। দীর্ঘ এক মাস রাত জেগে প্রায় শ দেড়েক কবিতা লেখার পর একটি স্বনামধন্য পত্রিকায় কয়েকটি লেখা ছাপতে দিলেন। কিন্তু সাহিত্য সম্পাদক কবিতাগুলো দেখে বললেন,

: ভাই, আমি দশ বছর ধরে সাহিত্য পাতা দেখছি। কিন্তু এমন কবিতা এই প্রথম দেখলাম। অনেক চেষ্টা করে এর মর্মার্থ আমি উদ্ধার করেতে পারছিনা। আপনি দয়া করে অন্য লেখা দিন।

এ কথা শুনে রাগ করে মামা কবিতা লেখাই ছেড়ে দিলেন। বাসায় ফিরে আমাকে বললেন,

: বুঝলি মৃদুল, আজকাল সাহিত্য জগতে যোগ্য লোকের বড় অভাব। তা না হলে আমার এরকম ফাটাফাটি লেখা গুলো ওই ব্যাটা সম্পাদক বুঝতেই পারলনা। আমি বললাম,

: হ্যাঁ মামা ঠিক বলেছ,আসলে সম্পাদক একটা গো মুর্খ।

: মামা বললেন , সত্যিই এদেশে গুণী লোকের কদর নেই।

মামা বি,এ, পাশ করেছেন দু'বছর আগে। তারপর থেকে ঘরে বসা। চাকরির চেষ্টা তিনি

কোনকালেই করেননি। তার ধারণা চাকরি মানেই দিন রাত বসের ধমক খাওয়া আর বসকে তোষামোদ করা। এসব তিনি করতে পারবেন না। আমার নানা-নানী গত হয়েছেন অনেক আগে। তারপর থেকে মামা আমাদের সাথেই আছেন। মাঝে মাঝে মা অবশ্য তাগাদা দেন বাবার অফিসে বসার জন্য। কিন্তু এ কথাগুলো মামার কানে ঢুকলেও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়না। কবিতা লেখা ছাড়ার পর মামা বেশ কিছুদিন মনমরা হয়ে রইলেন। এসময় তিনি চিন্তা করলেন নতুন কি করা যায়। একদিন শুনলাম আমাদের পাড়ায় একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে । আগামী সোমবার সেটি অনুষ্ঠিত হবে। ক্লোজ আপ ওয়ান এর শীর্ষ দশ এর কয়েকজন শিল্পী গান শোনাতে আসবেন। এছাড়া পাড়ার কিছু শিল্পীও সেদিন গান গাইবেন। এই প্রোগ্রামের কথা শোনে মামা বেশ উৎসাহিত হলেন। আমাকে বললেন

: জানিস মৃদুল, এইসব শিল্পীদের আমি টি.ভি. তে দেখেছি। ওদের গান আমার বেশ ভালো লাগে। সোমবারের অনুষ্ঠান কিছুতেই মিস্ করা যাবেনা।

আমি বললাম,

: মামা আমাকে কিন্তু নিয়ে যেতে হবে। মামা রাজী হলেন। অবশেষে সেই প্রতিক্ষিত সোমবার এলো। আমরা গেলাম প্রোগ্রাম দেখতে। খুব সুন্দর হলো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। মামা তো মহা খুশী অনুষ্ঠান দেখে। কিন্তু বাসায় ফিরেই মন খারাপ করে শুয়ে পড়লেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

: মামা কি ব্যাপার , মন খারাপ কেন ?

মামা বললেন,

: দেখলি ভাগ্নে , গান শেষ হওয়ার পর সবাই কিভাবে শিল্পীদের কাছ থেকে হুমড়ি খেয়ে অটোগ্রাফ নিচ্ছিল। তাই দেখে আমার খুব হিংসে হচ্ছিল। ওদের কত সম্মান। অথচ আমাকে কেউ চেনেনা।

আমি বললাম,

: তাহলে তুমি এমন কিছু কর যেন মানুষ তোমার কাছ থেকেও এভাবে অটোগ্রাফ নেয়।

: মামা বললেন, হ্যাঁ আমাকে সেরকম কিছু করতে হবে। আমি একদিন বিখ্যাত গায়ক হয়ে দেখিয়ে দেব।

: আমি অবাক হয়ে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমাদের এলাকায় বাস করেন বিখ্যাত রাগ সঙ্গীত গায়ক ওস্তাদ মুনশী হেদায়েত উল্যাহ। পরদিন মামা ওস্তাদজীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন। মামা বললেন,

: ওস্তাদজী যেমন করেই হোক আমাকে আপনি গান শেখান। মানুষ আমাকে নিয়ে এখন উপহাস করে। আমি ওদের উপহাসের জবাব দিতে চাই। ওস্তাদ বললেন,

: আরে ব্যাটা, এত তাড়াহুড়ো করলে কি গান শেখা যায়। গান হচ্ছে সাধনার বিষয়। নিয়ম

মতো সাধনা করলে তুই অবশ্যই একদিন বিখ্যাত গায়ক হতে পারবি। মামা ওস্তাদজীর পা ছুঁয়ে সালাম করে বাড়ী ফিরে এলেন।

বাড়ী ফিরেই মাকে বললেন,
: আপা, আমাকে একটা হারমোনিয়াম কিনে দিতে হবে। আমি ঠিক করেছি গায়ক হব।
মা চোখ কপালে তুলে বললেন,
: কি বলছিস? তুই হবি গায়ক? এই বুড়ো বয়েসে গান শেখার নামে আমাদের কানের তো বারোটা বাজাবি।
মামা মুখটা গম্ভীর করে বললেন,
: দেখো আপা, শেখার কোন বয়েস নেই। আর কানের বারোটা বাজাবো বলছো? আমি গান শিখে যখন বিখ্যাত গায়ক হবো, তখন তুমিইতো গর্ব করে বলবে, এই যে আসিফ মাহমুদ এর গান শোনেন আপনারা, সে আমার আদরের ছোট ভাই।
মা একথা শুনে মুখে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করলেন। ভাগ্যিস মামা তা দেখতে পেলেন না। মা তো কিছুতেই রাজী না হারমোনিয়াম কিনে দিতে। মামা মুখ ভারী করে ঘুরে বেড়ান। কেউ কিছু বললে উত্তর দেন না। আমি একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম,
: মামা, এখন কি করবে?
: শোন মৃদুল, পৃথিবীর বড় বড় সব কাজের শুরুতেই বাধা এসেছে। তাই বলে কেউ পিছ পা হয় নি। বাধা জয় করে যারা এগিয়ে যেতে পেরেছে তারাই হয়েচে জগদ্বিখ্যাত। আমাকেও সেই কঠিন বাধা পেরোতে হবে...। আমি বললাম,
: তো এখন সেই বাধা পেরোবার রাস্তাটা কি?
: দেখ, আমার গান শেখার প্রবল ইচ্ছে আমাকে মনের মাঝে অসম্ভব জোর এনে দিয়েছে। এখন আমি এর জন্যে অনেক কিছুই করতে পারি। প্রয়োজনে নিজের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। বিনা যুদ্ধে নাহি দিবো সুঁচাগ্র মেদিনী...। আমি বললাম,
: না মামা, প্রাণ দেয়াটা ঠিক হবে না। তাহলে গান শিখবে কি করে ? ভুতেরা কি আর গান শিখতে পারে ? মামা আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। আমি তো একটু ভয়-ই পেয়ে গেলাম। কিন্তু আস্তে আস্তে মামার চেহারাটা শান্ত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ ঘরের ভেতর পায়চারি করলেন। হঠাৎ ডান হাত দিয়ে বা হাতের থালুতে একটা ঘুষি মেরে বললেন,
: ভাগ্নে, ইউরেকা। গ্রেট আইডিয়া। অনশন। হ্যাঁ, অনশন করবো আমি। আমরণ অনশন এর বিকল্প নেই। আমি অবাক হয়ে তাকালাম। অনশন বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার বা প্রেসক্লাব এর সামনে শুয়ে বসে থাকা কিছু মানুষ। কারো কারো চাদর এর তলা থেকে একটা হাত বেরিয়ে আছে, স্যালাইন সহ। নাদুস নুদুস শরীরটা নিয়ে মামা সেভাবে শুয়ে আছেন, এটা ভেবেই হাসি পেয়ে গেলো। কিন্তু মামার এমন সিরিয়াস

মুডের সময়ে আমার হেসে ফেলা ঠিক হবে না ভেবেই অনেক কষ্টে হাসিটা গিলে ফেললাম। মামাকে জিজ্ঞস করলাম,

: অনশন? তা কোথায় করবে?

: কেন, আমার ঘরে বসে। মামার সোজা উত্তর।

: মানে? ঘরে বসে অনশন হয় নাকি?

: আলবৎ হয়। শোন, অনশন করছি সেটাই মূল ব্যাপার। কোথায়, কিভাবে করছি সেটা তুচ্ছ।

: ও। শুকনো গলায় বললাম আমি।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি বাবা মা কথা বলছেন।

: তা, পাগলামি রোগটা কি তোমাদের বংশগত? মানে আমি বলতে চাইছি তোমার জানা মতে কেউ কি পাগল ছিলো তোমাদের নানা বা দাদার দিকে? বাবা টাইয়ের নট বাধতে বাধতে প্রশ্ন করলেন মা'কে।

আমি একটু উকি মেরে দেখলাম, মায়ের ফর্সা চেহারায় ডুবতে থাকা সূর্যের লালচে আভাস।

: তুমি কি বলতে চাইছো? আমরা পাগল?

: আহা, খেপছো কেনো ? আমি কি বলেছি তোমরা পাগল ? আমি জানতে চাইছি তোমাদের বংশে কেউ পাগল ছিলো কি না।

: এর মানে কি দাঁড়ায় ? এর মানে তো এই দাঁড়ায় যে আমাদের বংশে কেউ পাগল ছিলো।

: না, ঠিক তা নয়। তবে একজন সুস্থ মানুষ নিশ্চয়ই দরোজায় ব্যানার টানিয়ে ঘরে বসে থাকবে না।

আমি বাবা মায়ের কথা শোনা বাদ দিয়ে ছুট দিলাম মামার ঘরের দিকে। দরোজার সামনে গিয়ে আমার ভিরমী খাওয়ার জোগার। একটা কাগজে বড় বড় করে লেখা।

" দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আমরণ অনশন। নীরবতা কাম্য।"

আমি ভয়ে ভয়ে দরোজায় নক করলাম। ভেতর থেকে মামার গুরুগম্ভীর গলা,

: যতই সাধাসাধি করো আপা, আমার দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত পানি স্পর্শ করবো না।

আমি একটু ঢোক গিলে বললাম,

: মামা, আমি মৃদুল।

: ও, মৃদুল। আয়, ভেতরে আয়।

ভেতরে ঢুকে দেখি মামা বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন।

: অনশন শুরু করে দিলে মামা ?

: হ্যাঁ। তা তোর বাবা মায়ের এ্যাক্সপ্রেশন কি? উৎসাহের সাথে জানতে চাইলেন মামা।

: এ্যাক্সপ্রেশন আর কি, বাবা বলছে তোমাদের বংশে কেউ পাগল ছিলো কি না ?

মামা একটু রাগত স্বরে বললেন

: ও, এরমাঝে শুরু হয়েছে ক্রিটিসাইজ। ও কে, নো প্রবলেম। শোন, পৃথিবীতে সব সৃষ্টিশীল

মানুষকেই প্রথমে সবাই পাগল ভাবতো, তাদের চিন্তা চেতনা নিয়ে হাসা হাসি করতো। কিন্তু তাই বলে কি থেমে যেতে হবে ? বাধা আসবেই, হোক তা সমুদ্রের ঢেউ এর মতো বিশাল,হোক পাহাড় সমান উঁচু, হোক প্রলয়ংকরী.....। মামার বাক্যবাণ ছুটতে লাগলো উল্কার গতিতে। আমি ভাবলেশহীন মুখে বসে শুনতে থাকলাম। অবশেষে মামা থামলেন। বললেন,

: অনেক কথা হলো। এখন আমাকে একা থাকতে দে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল, সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলো। মামা পূর্ববত। কোন বিকার নেই। প্রথমে মা দু একবার খেতে ডাকলেন। কিন্তু মামা সিদ্ধান্তে অটল। রাতেও কিছু খেলেন না মামা। খাবার টেবিলে বাবা বললেন,

: তা, কোন টি.ভি চ্যানেল মনে হয় খবর পায়নি। দশ দশটি চ্যানেল। এরকম হারমোনিয়াম এর দাবীতে অনশন বাংলাদেশে নয়, বিশ্বেও নিশ্চয়ই প্রথম। খবর পেলে তারা ছুটে আসতো।

: আচ্ছা, তুমি আমার ভাই কে নিয়ে কি শুরু করলে? ও তোমার কি ক্ষতি করেছে।

: না না, ক্ষতি করবে কেনো। বরং চারপাশে জানাজানি হলে সবাই যখন প্রশ্ন করবে, এটা সেটা জানতে চাইবে, তখন আমি কি উত্তর দেবো সেটাই ভাবছি। মা মুখ ভার করে খেতে থাকলেন। কোন জবাব দিলেন না।

পরদিন সকালে মা যখন দেখলেন, কিছুতেই মামাকে খাওয়ানো যাচ্ছে না, এবং আমাদের বুয়ার কল্যাণে পাশের ফ্ল্যাট এর সাদীব এর আম্মু এসে জানতে চাইছেন ঘটনা কি তখন রাজী হলেন হারমোনিয়াম কিনে দিতে।

হারমোনিয়াম কেনা হলো। মামা হাসিমুখে নিউট্রিসি-র গ্লাসে চুমুক দিয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন। আমাকে বললেন,

: দেখলি ভাগ্নে, যুদ্ধ জয়ের প্রথম ধাপ পেরুলাম। এবার শুধুই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমি এই প্রথম একটু উৎসাহ বোধ কররাম। আসলেই তাই। বাবা মা এর কাছ থেকে হারমোনিয়াম আদায় করা কঠিন কাজই তো।

পরদিন থেকে শুরু হলো মামার রেওয়াজ। বড়ই কঠিন রেওয়াজ। আগে সকালে আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলতে হতো। এখন মামার বদান্যতায় আমি কারো সাহায্য ছাড়াই লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ি। কারণ মামার এই বেসুরো গলায় আ-আ শুনলে নিশ্চয়ই কুম্ভকর্ণেরও ঘুম ভেঙে যেত। বন্ধুরা জানতে চায় আমার কাছে ঘটনা কি? আমি একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য মুখে এনে বললাম।

: বল্টু মামা গান শিখছেন। তাই রেওয়াজ করতে হয়।

তাই শুনে আফরীন আপু বললেন,

তা মৃদুল, এভাবে চিৎকার করাকে বুঝি রেওয়াজ বলে ?

: আসলে এটা গান শেখার প্রথম ধাপ তো, তাই ওরকম শোনায়। কিছুদিন গেলে গলায় সুর বসবে। তখন সুরেলা আওয়াজ বের হবে।
মুখের হাসি চেপে রেখে নাঈম ভাইয়া বললো,
: বাহ মৃদুল। এরকম গুণী মামার পাশে থেকে তুই দেখি সঙ্গীতের খুটিনাটি অনেক ব্যাপার জেনে গেছিস। তো, সুরটা তাড়াতাড়ি বসলেই আমরা বাঁচি। সামনে মিডটার্ম। রাত জেগে পড়াশোনা করি। সকালের ঘুমটাই মাটি হয় বল্টু মামার রেওয়াজে। এটা শুনে সবাই হাসির তুফান তুললো।

আশে পাশের মানুষ যাই বলুক, হাসুক বা কাঁদুক, মামা নির্বিকার। তার ধ্যান জ্ঞান এখন গান। প্রতিদিন বিকালে একঘন্টা কাটান ওস্তাদজীর বাড়ীতে গান শিখে। বাকী সময় বলতে গেলে রেওয়াজ করেই কাটে। ঠিকমতো খাওয়ার সময়টাও তার এখন নেই। বাসার সবাই তার এই চিৎকারের জ্বালায় অতিষ্ট। আশে পাশের বাসা থেকেও অভিযোগ আসতে লাগল। প্রতিবেশীরা বললেন, বাচ্চাদের পড়ালেখার খুব অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের শাফিন এর আম্মা মামার ওপর খুব খুশী। কারণ হলো শাফিনের দুই বছর বয়সী ছোট ভাই বাপ্পা। আগে নাকি বাপ্পা সময়মতো খেতনা। এখন মামা যখন রেওয়াজ শুরু করেন তখন তাকে খেতে বসান হয়, এবং এই বলে ভয় দেখান হয় না খেলে তাকে মামার কাছে দিয়ে আসা হবে। একথা শুনে বাপ্পা নির্বিঘ্নে খাওয়া শেষ করে। বাবা একদিন মামাকে জিজ্ঞেস করলেন,
: শালাবাবু , তোমার জ্বালায় তো পুরো পাড়া অস্থির। আমরা কবে নাগাদ এর থেকে নিস্তার পাবো ? একথা শুনে মামা বললেন,
: দুলাভাই, আজকে আপনি আমাকে উপহাস করছেন। কিন্তু আমি এতে রাগ করছিনা। কারণ আমি জানি ক'দিন পড়েই আপনি আমার জন্য গর্ববোধ করবেন। বাবা মুচকি হেসে বললেন ,
: ঠিক আছে আমি সেই দিনের অপেক্ষায় থাকলাম।
মামার রেওয়াজ পুরোদমে চলতে থাকল। সামনে মহান বিজয় দিবস। পাড়ায় আবার সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। মামা নাকি এবার সেখানে গান গাইবেন। উদ্যোক্তাদের বলে কয়ে তিনি একটি গান গাওয়ার জন্য সময় চেয়ে নিলেন। আমি শংকিত বোধ করলাম। কারণ মামা এখনো গান পুরোপুরি শিখেননি। এ অবস্থায় দর্শকদের সামনে গান গাইতে গিয়ে কি অবস্থা হয় কে জানে। তবে মামা আমাকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি বললেন,
: দেখিস ভাগ্নে , শুধু পাড়ায় নয় আমি সারাদেশে হইচই ফেলে দেব। ওস্তাদজীও খুব আশাবাদী। তিনি বললেন,
: একদম ঘাবড়াবিনা। মনে সাহস রাখবি। মামা আশায় বুক বেঁধে অনুষ্ঠানের জন্য তৈরী হতে

লাগলেন। অনুষ্ঠানের দিন এসে গেলো। সকাল বেলা মামার চেহারা দেখে বুঝলাম গত রাতে এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি। আমি বললাম,

: মামা ভয় পেয়োনা। আমার মনে হয় তুমি ভালোই করবে। মামা বলল,

: দূর বোকা। আমি একদম ভয় পাইনি। কিন্তু মামার মুখ দেখে আমার তা মনে হলোনা। পাঁচটার সময় অনুষ্ঠান শুরু। চারটা থেকে মামা তৈরী। বাবা, মা আর আমাকে নিয়ে মামা পৌনে পাঁচটায় পৌছে গেল। অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রথমে কয়েকজন শিল্পী গাইলেন। এবার ঘোষক এসে বললেন,

: এবার আপনাদের গান গেয়ে শোনাবেন, নবীন শিল্পী আসিফ মাহমুদ বল্টু। মামা স্টেজে আসলেন। সাদা চুড়িদার পায়জামা আর আড়ংয়ের পাঞ্জাবী তে মামাকে বেশ স্মার্ট লাগছিল। মামা হারমোনিয়াম সামনে নিয়ে বসলেন। আমার বেশ টেনশান হচ্ছিল। মামা সবার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। তারপর একটু কেশে গলা পরিস্কার করে নিলেন। এবার আ-আ-আ করে গলা সাধা শুরু হলো। মিনিট খানেক চললো এই আ-আ। এরমাঝে দর্শকরা উসখুস করতে শুরু করলো। মামা একটু থামলেন। সবাই ভাবলো এইবার বুঝি গান শুরু হবে। কিন্তু আবার শুরু গলা সাধা। একজন দর্শক তো বলেই বসলো।

: ওই মিয়া, কি শুরু করছেন। অনেক তো আ-উ করছেন। এইবার গান করেন। অবশেষে মামা গানে টান দিলেন। কিন্তু এ কি ব্যাপার। মামার গলা দিয়ে এমন সুর বেরুচ্ছে কেন। মনে হচ্ছে কেউ যেন চিৎকার করে কাঁদছে। দর্শকদের কান বেশীক্ষণ মামার গান সহ্য করতে পারলনা। তারা হইচই শুরু করে দিল। তারপর শুরু হল জুতা স্যান্ডেল নিক্ষেপ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি মামা মঞ্চে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সেটা কারো পাদুকার আঘাতে নাকি দর্শকদের চিৎকারে তা বুঝলাম না। আয়োজকরা ধরাধরি করে মামাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। অনুষ্ঠান সাময়িক ভাবে বন্ধ রইল। ওদিকে মাথায় পানি ঢেলে মামার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হলো। ধীরে ধীরে চোখ মেলে মামা বললেন,

: সত্যিই এদেশে গুণী লোকের কদর নেই।

হারজিৎ

মন খারাপ করে মাঠের এক কোণে বসে আছে আনন্দ। চোখ দুটো ছলছল করছে। একটু চাপ দিলেই বুঝি পানি গড়িয়ে পড়বে। মন খারাপ হবে নাইবা কেন ? একতা ক্রিকেট ক্লাবের অধিনায়ক সে। আজ তাদের খেলা ছিল ফ্রেন্ডশীপ বয়েজ ক্লাবের সঙ্গে। সেই খেলায় একতা হেরেছে শোচনীয় ভাবে ৭২ রানে। ক্লাব তৈরী হওয়ার পর এমন বাজে ভাবে তারা হারেনি। অথচ এই খেলা নিয়ে তাদের কত স্বপ্ন ছিল। ফ্রেন্ডশীপের অধিনায়ক বাবুকে সেই প্রথম বলেছিল খেলার জন্য। বাবু বলেছিল,

: তোরা কি আমাদের সাথে পারবি ? একথা শুনে আনন্দ রেগে গিয়ে বলেছিল,

: খেলেই দেখনা। একতা ক্লাব এখনো কোন ম্যাচ হারেনি। কিন্তু একতাই হেরে গেল।

এখন থেকে দেখা হলেইতো বাবু আর ওর বন্ধুরা ওকে লজ্জা দেবে। দুইদলের মাঝে একতাই ছিল ফেভারিট। কিন্তু গত পরশু সহ-অধিনায়ক শুভর সাথে ওর বেশ বড় রকমের ঝগড়া হয়েছিল। এ কারণে শুভ খেলেনি। সেই সাথে শুভর দুই বন্ধু সুমন আর আকাশও খেলেনি। এক সঙ্গে তিনজন ভালো খেলোয়াড় না খেলায় একতা ক্লাব বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। আর সেই সুযোগেই জিতে গেল ফ্রেন্ডশীপ ক্লাব। আনন্দ কিন্তু কল্পনাও করেনি এমনভাবে হারবে। পরশু দিনের ঝগড়ার জন্য কিন্তু শুভর দোষটাই বেশী। বিকেলে সবাই মিলে

খেলছিল। আনন্দর বলে শুভ কট বিহাইন্ড হলো। কিন্তু শুভ বলল বল নাকি তার ব্যাটেই লাগেনি। তাই সে নট আউট। কি আর করা। আউট না দিলে তো জোর করে নেয়া যাবেনা। আনন্দ বলল,

: ঠিক আউট যখন দিচ্ছিস না তখন খেল। একথা শোনে শুভ রেগে গিয়ে বলল,

: তুই এমন কি আহামরি বোলার যে তোর বলে আমাকে আউট হতেই হবে। এই রকম কথা শুনলে কার না রাগ ওঠে ? আনন্দও রেগে গিয়ে বলল,

: লজ্জা করেনা আউট হয়েও ক্রীজে দাঁড়িয়ে আছিস। তোর মত খেলোয়াড়ের ক্রিকেট খেলার যোগ্যতাই নেই।

: ঠিক আছে খেললাম না তোদের সাথে। শুভর কাটা জবাব।

এই হল ঘটনা। হারার পর থেকে এ কথাগুলো আরো বেশী করে মনে পড়ছে আনন্দের। সে না হয় রাগ করে একটা কঠিন কথা বলেই ফেলেছে। তাই বলে এরকম একটা ইম্পোর্টেন্ট ম্যাচে শুভ খেলল না। এখন যে তারা হেরে গেল সেটা কি শুধু আনন্দের লজ্জা ? এই লজ্জা তো পুরো এলাকার। শুভর তো এই কথাটা একটু ভাবা উচিৎ ছিল। এসব ভাবতে ভাবতে আনন্দ কেমন জানি আনমনা হয়ে গেল। হঠাৎ পিঠের মাঝে মৃদু চাপড়ে তার ধ্যান ভাঙলো। পেছনে তাকিয়ে দেখে সাদী।

একতা ক্লাবের আর এক সদস্য। সাদী বলল,

: আরে ব্যাটা, এতো কি চিন্তা করছিস ? এই খেলায় হেরেছি তো কি হয়েছে। ফিরতি ম্যাচে আমরা জিতব। সন্ধ্যা হয়ে গেছে । এবার বাড়ী চল। দুজনে বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগল। বাসায় ফিরেও আনন্দের মনটা ভালো হলোনা। স্কুল এখন ছুটি। তাই পড়ালেখার তেমন চাপ নেই। গতকাল ইমন এর বাসা থেকে নিয়ে আসা তিন গোয়েন্দার নতুন বইটাও পড়তে ইচ্ছে করছেনা। সে রাতে তার ভালো ঘুম হলোনা। সকালে উঠেই সিদ্ধান্ত নিল সে শুভর বাসায় যাবে। যেভাবেই হোক শুভকে রাজী করাবে খেলার জন্য। পরের খেলায় একতাকে জিততেই হবে।

দরজা খুলে শুভ বেশ অবাক হয়ে গেল। মাত্র তিনদিন আগেই যার সঙ্গে এত বড় ঝগড়া হয়ে গেল, সেই আজ তার বাসায় এসে হাজির। তবুও কিছুটা রাগের ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করল,

: কি ব্যাপার ?

: বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবি নাকি ?

এবার শুভ কিছুটা লজ্জা পেল। বলল,

: না, তা কেন। আয়, ভেতরে আয়। ভেতরে বসে আনন্দই প্রথম কথা শুরু করল।

: খবর পেয়েছিস নিশ্চয়ই। আমরা ফ্রেন্ডশীপের কাছে হেরে গেছি। শুভ এ কথা কালকেই

জানতে পেরেছে। আনন্দের মুখে আবার শোনার পর তার একটু লজ্জা লাগল। কারণ এই হারের পেছনে সে তো একটু হলেও তো দায়ী। সে বলল,

: হ্যাঁ, শুনেছি।

: তোরা খেললে হয়তো আমরা জিততে পারতাম। রাগ করে কি না কি বলেছি তাই বলে মাঠেই এলিনা ? এখন কি ওরা আমাকে একা লজ্জা দেবে ? তোকে দেবেনা ? তুই কি একতার সদস্য না ? এক নিঃশ্বাসে এত গুলো কথা বলে আনন্দ একটু হাঁপাতে লাগল। একটু থেমে আবার বলল,

: শুভ, তুই, আমি সবাই মিলে আমাদের ক্লাবের নাম রেখেছিলাম একতা। এখন এই একতা ক্লাবে যদি সবার মাঝে একতাই না থাকে তবে ক্লাব ভেঙে ফেললেই হয়। শুভ এবার বেশ লজ্জা পেল। বলল,

: না আনন্দ, ক্লাব ভাঙতে হবেনা। আমি পরের ম্যাচে অবশ্যই খেলব । কালকে না খেলে আমি ভুল করেছি। আমাকে তুই মাফ করে দে। দুই বন্ধু হাত মেলাল।

পরদিনই ঠিক হলো পরের শুক্রবার খেলা। ফ্রেন্ডশীপের ক্যাপ্টেন বাবু বলল,

: কিরে, আবার হারার শখ হয়েছে নাকি ?

আনন্দ চুপ করে রইল। মনে মনে ভাবল, একথার জবাব আমরা মুখে নয় ব্যাটে-বলে দেব।

আজ খেলা। একটু পরেই শুরু হবে। একতা ক্লাব টিম মিটিংয়ে বসল। আনন্দ বলল ,

: আমাদের জন্য এই ম্যাচ খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ। গত খেলায় আমরা হেরেছি। এই খেলায় আমরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে খেলছি। এবার আমাদের জিততেই হবে। সবাই আনন্দের হাতের ওপর হাত রাখল।

টস জিতে গেল ফ্রেন্ডশীপ ক্লাব। তারা ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিল। একতার সদস্যদের একটু মন খারাপ হলো। তা দেখে শুভ বলল,

: আরে টস জেতা মানেই ম্যাচ জেতা নয়। এখন ওদের কম রানে অল-আউট করতে হবে। খেলা শুরু হলো। একতার উদ্বোধনী বোলার সজীব বোলিং শুরু করল। প্রথম তিন বলে কোন রান হলোনা। কিন্তু চার নাম্বার বলটা পড়ল শর্টপিচ। ফ্রেন্ডশীপের ওপেনিং ব্যাটসম্যান সুজন পুল করে বলটাকে সীমানা পার করল। ওদের সমর্থকরা খুশীতে লাফাতে লাগল। আনন্দ দৌড়ে গেল সজীবের কাছে। বলল,

: ভয়ের কিছু নেই। ঠিক লাইনে বল করে যা। দেখবি আউট হয়ে যাবে। পরের বলে কোন রান হলোনা। ওভারের শেষ বল। সজীব দৌড় শুরু করলো। বল করলো। বলটা পিচ করলো মিডল ষ্ট্যাম্পের একটু বাইরে। আউটসুইং বলটা বেরিয়ে যাবার সময় সুজন কাট্ করার চেষ্টা করল। বলটা তার ব্যাট স্পর্শ করে জমা পড়ল উইকেট-কিপার তমালের *গ্লাভসে।* আউট। নেচে উঠল একতার খেলোয়াড়, সমর্থক সবাই। শুরুতেই এই আঘাত

কাটিয়ে উঠতে পারলনা ওরা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট পড়তে থাকল। মাঝখানে অবশ্য অধিনায়ক বাবু একটু ভালো খেলছিল। কিন্তু আনন্দের গুগলিতে ও পরিস্কার বোল্ড হয়ে গেল। ২০ ওভারের খেলা। ফ্রেন্ডশীপ ১৯.৪ ওভারে ১১৯ রানে অল-আউট হয়ে গেল।
একতা ব্যাটিংয়ে নামল । প্রতি ওভারে ৬ রান করে করতে হবে ম্যাচ জিততে হলে। সাদী আর ইমন দুই ওপেনার। আনন্দ খুব টেনশানে আছে। তার এই দুঃশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল যখন ৩য় বলে কোন রান না করেই ইমন বোল্ড হয়ে ফিরে এল। দেখতে দেখতে ২২ রানে তিন উইকেট পড়ে গেল। ফ্রেন্ডশীপের সমর্থকরা উল্লাস করছে। ৪র্থ উইকেটে আসিফ আর রাজু ৩২ রান যোগ করল। ৫৪ রানের মাথায় আসিফ আউট। ৬২ তে রাজু। ৭৪ রানে আউট হলো আকাশ। একতা ক্লাবের জয়ের জন্য দরকার আরো ৪৬ রান। বল আছে ৪২ টি। আর হাতে ৪ উইকেট। ক্রীজে আনন্দ আর শুভ। আনন্দ বলল,
: উইকেটে টিকে থাকলে রান আসবে। ভালো বলে সিঙ্গেলস বের করতে হবে। আর লুজ বলে বাউন্ডারী। শুভ বললো,
: ঠিক আছে, তাই করব। ওরা দু'জন বেশ ভালো খেলতে লাগল। আজ জিততেই হবে একতাকে। মনের মাঝে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। খুব বেশী দূরে নয় জয় থেকে একতা। খেলার শেষ ওভার। ৬ বলে দরকার ৮ রান। ষ্ট্রাইকে শুভ। প্রথম বলে ১ রান হলো। দ্বিতীয় বলে আনন্দ ১ রানের বেশী নিতে পারলোনা। বাবু বেশ ভালো বল করছে । পরের তিনটি বলেও ১রান করে হলো। শেষ বল । ১ বলে দরকার তিন রান। এখন আনন্দ ষ্ট্রাইকে। ওর চোখে দৃঢ় প্রত্যয় দেখতে পেল শুভ। বাবু দৌড় শুরু করেছে । বলটা এবার ছাড়লো। দু'দলের খেলোয়াড় আর সমর্থক সবার চোখ এখন পীচের ওপর। বাবু চেয়েছিল ইয়র্কার মারতে। আনন্দ একপা এগিয়ে বলটা হাফভলি বানিয়ে হিট করল। মূহুর্তের মধ্যে বল সীমানা পার হয়ে গেল লং-অফ আর লং-অনের মাঝখান দিয়ে। জিতে গেল একতা। সবাই আনন্দকে মাথায় তুলে নাচতে লাগল। বোলিংয়ে ৩ উইকেট আর ব্যাটিংয়ে অপরাজিত ২২ রান করে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হল আনন্দ। শুভ বলল,
: আজকে আমরা আনন্দর জন্যই জিততে পেরেছি। ওই আজকের জয়ের নায়ক। কিন্তু আনন্দ সেটা মানতে নারাজ। সে বলল,
: আজ আমরা সবাই মিলে খেলেছি বলেই জিততে পেরেছি। এই জয় হলো একতার। একসাথে কাজ করলে সব কাজেই সাফল্য আসে।
সবাই খুশী মনে বাড়ীর পথ ধরল বিজয়ীর বেশে।

সুমন নামের সাহসী ছেলেটি

বেশ ক'দিন ভ্যাপসা গরমের পর আজ বিকেলে বৃষ্টি হয়েছে। তাই বিকেলটা খুব সুন্দর লাগছে। বৃষ্টির পানিতে ধোয়া গাছের পাতা আর সবুজ দুর্বাঘাসগুলো যেন হাসছে। সুমন বসে আছে সোহাগী নদীর পারে। শিমুলপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা এই নদীটি সবারই প্রিয়। ভরা বর্ষায় কত দূর দূরান্ত থেকে নানা রঙের পাল তোলা নাও বয়ে যায় এই নদীর বুক দিয়ে। গাঁয়ের বৌয়েরা নৌকা করে বাবার বাড়ী বেড়াতে যায়। তাদের চোখে মুখে তখন দেখা যায় খুশীর ঝিলিক। সুমন তার দাদু কলিম শেখ এর মুখে শুনেছে তাঁর যুবক বয়েসে নাকি এই নদীর বুকে নৌকা বাইচ হতো। আশে পাশের গ্রাম থেকে বাইচ এ অংশ নিতে আসতো অনেক দল। প্রতিযোগিতার ক'দিন আগে থেকেই সবার মনে সে কি উৎসাহ। আর যেদিন বাইচ হবে সেদিন তো নদীর দুই পাড়ে হাজার মানুষের ঢল নামতো। পছন্দের দলকে চিৎকার করে নেচে গেয়ে উৎসাহ যোগাতো মানুষেরা। বিজয়ীদের দেয়া হতো আকর্ষণীয় উপহার। শিমুলপুর যে বার জিতে যেতো এই বাইচে, এরপর কদিন চলতো গ্রামে উল্লাস। গ্রামের সবাই মিলে আয়োজন করতো গান এর অনুষ্ঠান রাত ভর। আর চলতো গরু জবাই করে খাওয়া দাওয়া। আহা, কি আনন্দের দিন গেছে। বলতে বলতে বুড়ো কলিম শেখ এর দু'চোখ আবেগে ছলছল করে উঠে।

এখন সেই সব দিন হারিয়ে গেছে। বাইচ হয়না অনেকদিন। সময় এর সাথে সাথে অনেক কিছুই হারিয়ে যায়। কিন্তু সময় তো আর থেমে থাকে না। সে তার আপন নিয়মে বয়ে চলে। নদীতে দুপুরবেলা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মেতে উঠে দুরন্ত খেলায়, গোসল করার ছলে। কেউ বা ডুব সাঁতার দিয়ে অনেক পরে মাথা ভাসায়। কে কত বেশী ডুবে থাকতে পারে, যেন এটা একটা অলিখিত প্রতিযোগিতা। কেউ আবার নদীর পাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে। পানিতে দাপাদাপি করে একেকজনের চোখ লাল হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত বড় কেউ এসে ধমক না দিয়ে তুলে দেন, চলতে থাকে এই নির্দোষ দুষ্টুমী।

সুমন একটু ভাবুক প্রকৃতির। অনেক সময় সে বসে বসে ছোট বাচ্চাদের এই কাণ্ড দেখতে থাকে। আর মনে পড়ে যায় ছোট্টবেলার কথা। একটা সময় সেও বন্ধুদের নিয়ে এই সোহাগী নদীতে সাঁতার কেটেছে। কখনো নৌকা করে আবার কখনো বা কলা গাছের ভেলা বানিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে নদীর বুকে। শীতের সময় বন্ধুরা মিলে দল বেধে নদীর চরে কাশবনে মেতে উঠতো লুকোচুরি খেলায়। ছোট্টবেলার কথা মনে হতেই স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠে একটি চেহারা। হাসিমুখ আর মজবুত শরীরের একজন ভালোমানুষ। রহিম শেখ। সুমনের প্রিয় বাবা। যার কাঁধে চড়ে মেলায় যেতো বাঁশী আর খেলনা কিনতে। মেলায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেলে সুমনকে কিনে দিতো গরম জিলাপী, বাতাসা। রাতের বেলায় বুকের ওপর শুইয়ে ঘুম পাড়াতো। সবার প্রিয় ছিলো রহিম শেখ। দারুণ পরিশ্রম করতে পারতো। সেই ভোর বেলা গোয়াল থেকে দুধ দুইয়ে চলে যেতো ক্ষেতে। দুপুরবেলা সুমন ভাত নিয়ে যেতো বাবার জন্য। মাঝে মাঝে খাওয়ার ফাঁকে বাবা তুলে দিতো সুমনের মুখে ভাত। মুখ ভরা ভাত নিয়ে সুমন বাবাকে বলতো তার স্কুলের গল্প। আজকে কি কি শিখলো, বন্ধুদের খবর, লাল মুরগীর ডিম দেয়ার কথা। রহিম শেখের চোখে ঝরে পড়তো পুত্র স্নেহ। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন সুমনের। সুখের আর এক উৎস সুমনের আদরের ছোট্ট বোন আয়েশা। একদম পুতুলের মতো দেখতে। আধো আধো বোল আর টলোমলো পায়ে হেঁটে বেড়াতো সারা বাড়ি। ছোট্ট আয়েশা যেন সুমনের খেলার পুতুল। বাবা আয়েশাকেও খুব আদর করতেন। নিজে লেখাপড়া করতে না পারায় ইচ্ছে পোষণ করতেন দুই ছেলে মেয়েকেই তিনি স্কুলে পড়াবেন। মানুষের মতো মানুষ করবেন। আহা, কত সুন্দর স্বপ্নই না ছিলো বাবার। বাড়ির পেছনে সুমনকে নিয়ে করেছিলেন সব্জী বাগান। বেগুন, টম্যাটো,লাউ, শশা আর নানান ধরনের শাক। সকাল বিকাল বাবার সাথে পানি দিতো। সব্জী তোলা হলে হাটে নিয়ে যেতো বিক্রী করতে। কি সুখের দিন ছিলো সুমনদের। সুখ পাখিটা হঠাৎ করে উড়াল দিলো। একদিন বিকেলে বাবা ক্ষেত থেকে ফিরে এসে সুমনের মা'কে বললেন,

: বউ, আমার শরীলডা বালা ঠেকতাছে না। এক গেলাস পানি দেও। বলেই বসে পড়লেন

ঘরের বারান্দায়। সুমনের মা পানি নিয়ে এসে দেখলো জোয়ান মানুষটা কেমন যেন চুপসে গেছে। চোখ বড় বড় করে শ্বাস নিচ্ছে। সুমনের মা তাড়াতাড়ি তাকে শুইয়ে দিলো বিছানায়। চিন্তিত গলায় বললো,

: এহন কেমন লাগতাছে আপনের ? কি করি আমি... কই যাই। এই বলে ব্যাস্ত হয়ে পড়লো।

: চিন্তা কইরো না বউ, এমনিতেই বালা ঠেকতাছে না শইলডা। মাথাডা কেমুন জানি চক্কর দিলো। এট্টু শুইয়্যা থাহি, ঠিক হইয়্যা যাইবো।

সন্ধ্যায় সুমন বন্ধুদের সাথে গোল্লাছুট খেলে বাড়িতে এসে দেখে তার মায়ের চোখে পানি। বাবা শুয়ে আছে বিছানায়, মা বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর বাতাস করছে হাত পাখা দিয়ে। সুমনকে মা বললো,

: বাবা, তুই একটু তোর নিশানাথ কাকুরে খবর দে। পাশের বাড়ির থাইক্যা আমিনরেও লইয়্যা যা সাথে। বলতে বলতে চোখ মুছলেন মা।

: বাবা বললো, আরে আমার কিছু অয় নাই। অতো অস্থির হওনের কিছু নাই। পোলাডা খেইল্যা আইছে, হাত মুখ ধুয়া আসুক। নাস্তাপানি খায়া পড়তে বইবো। বাবারে, ভালা কইরা পড়বি।

একটু পড়ে বাবা উঠে বসলো। মা'কে বললো,

: সুমনের মা, অহন একটু ভালা ঠেকতাছে। কিছু খাইতে দাও। পেডে ভুখ লাগছে। মা ভাত বেড়ে আনলো। সুমন কে নিয়ে খেতে বসলেন বাবা। ঘুমন্ত আয়েশার দিকে তাকালেন মায়া ভরা চোখে। মা'কে বললেন,

: আমার আয়েশা মায়েরেও আমি পড়ামু। মাইয়া বইলা ঘরে বসায়া রাখুম না।

বাবা একটু ভালো বোধ করছে দেখে মায়ের মুখে হাসি ফুটলো। মা বললেন

: আইচ্ছা। যে পাকনা হইছে আপনের মাইয়া। সব বুঝে। কালকে দেখি বাগানের দিকে বদনা হাতে নিয়া যাইতাচে গাছে পানি দেওনের লাইগ্যা।

: তাই নাকি বউ? তাইলে আমার মা বড়ই বুদ্ধিমতী হইবো। সবাই হেসে উঠলো।

কিন্তু খাবার পর মুখে পান নিয়ে শুতে গিয়ে বাবা বললেন

: সুমন, বাবারে, আমার আবার একটু খারাপ লাগতাছে। সুমনের মা রান্নাঘরে হাড়ি পাতিল গুছিয়ে রাখছিলেন। এইকথা শোনে ছুটে এলেন। দেখলেন রহিম শেখ বারান্দায় ছুটে গিয়ে বমি করছে। একটু আগের সব খাবার মনে হয় বেরিয়ে আসছে পেট থেকে। সুমনের মায়ের চিৎকার শুনে পাশের বাড়ি থেকে কয়েকজন ছুটে এলো। রহিম শেখ এর বন্ধু আব্দুল ওয়াহাব ছুটলেন নিশানাথ কবিরাজ কে ডেকে আনতে।

নিশানাথ এই গায়ের নামকরা কবিরাজ। সবাই অসুখ বিসুখে তার কাছেই যায়। ডাঃ, হাসপাতাল তো সেই শহরে। খুব বেশী খারাপ অবস্থা না হলে কেউ যায় না শহরে। সবাই বলে বুড়ো নিশানাথ এর হাতে যাদু আছে। গাছ-গাছড়া দিয়ে তার বানানো কবিরাজী দাওয়াই খুব ভালো কাজ করে। তিনি এসে দেখলেন সুমনের বাবার গায়ে প্রচন্ড জ্বর। বমি বন্ধ হচ্ছে না। তিনি বাড়িতে লোক পাঠালেন কিছু ঔষধ আনতে। তারপর বললেন,
: মাথায় পানি ঢালো। চিন্তার কিছু নাই। আসলে অনেক খাটা খাটনী করে তো। তাই পিত্ত একটু গরম হইছে। অষুধ পড়লেই দেখবা সব ঠিক। সুমনের মায়ের চোখে অশ্রুধারা দেখে তিনি সান্ত্বনা দিলেন। মা, উপরওয়ালারে ডাকো, আর নিচে আমি তো আছি ই। সবাই ভরসা পেলো তার কথায়।ঔষধ খেয়ে মনে হয় একটু আরাম পেলো রহিম শেখ। ঘুমিয়ে পড়লো। আস্তে আস্তে সবাই চলে গেলো নিজের বাড়ী। যাবার আগে নিশানাথ বললো, এই অষুধটা দিয়া গেলাম। দুই দাগ কইরা খাওয়াইবা, দিনে তিনবার। সব ঠিক হইয়া যাইবো।
সকালবেলা রহিম শেখের শরীর আবার খারাপ করলো। সেই রাতের মতো বমি। আবার খবর দিতে গেলো নিশানাথ কবিরাজকে মানুষ। সুমনকে কাছে ডাকলেন রহিম শেখ। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, বাবারে, আমার সময় মনে অয় শেষ। তুই ভালা কইরা পড়বি। অনেক বড় মানুষ অইতে অইবো তোর। সুমনের মা, তুমি সুমন আর আয়েশারে দেখবা। সুমনের দুই চাচা তখন খাটের পাশে। বললো দু'জন, ভাইজান চিন্তা কইরেন না, আপনি ভালা অইয়া যাইবেন। আমরা তো আছিই। নিশানাথ কবিরাজ এসে দেখলেন অবস্থা খুব খারাপ। তিনি চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। তার তিরিশ বছরের কবিরাজী অভিজ্ঞতা, সুমন আর সুমনের মায়ের কান্না, সবকিছু ফাঁকি দিয়ে রহিম শেখ যাত্রা করলো অজানার উদ্দেশ্যে। একটা সাজানো বাগান যেন কালবৈশাখী ঝড়ে এলোমেলো করে দিলো। সুমন এর মা ছোট্ট আয়েশা আর সুমন কে নিয়ে পড়লেন অকূল সাগরে। রহিম শেখ বেঁচে থাকতে যে চাচারা সুমনদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় সাহায্য নিতো, তারাই রূদ্রমূর্তি ধারন করলো। সুমনদের জমি আস্তে আস্তে নিজের নামে করে নিতে থাকলো মিথ্যে দলিল দেখিয়ে। সেই সাথে চাপ দিলো সুমনের মাকে বাবার বাড়ি চলে যাবার জন্যে। কিন্তু রহিম শেখের শেষ ইচ্ছে পূরণ করা অর্থাৎ সুমনকে লেখা পড়া শেখাবার জন্য তার মা সব কষ্ট সহ্য করে রয়ে গেলেন। মানুষের বাড়ি বাড়ি কাজ করতে থাকলেন দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্য। সুমন তখন ক্লাস টু এর ছাত্র। খুব মেধাবী হবার কারণে স্কুল এর শিক্ষকরা সাহায্য করলেন। গ্রামের কয়েকজন বিত্তবান মানুষ এগিয়ে এলেন তার লেখাপড়ার খরচ দিতে। কিন্তু সুমনের মায়ের কষ্টের যেন শেষ নেই। সারাদিন বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করার পর ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরেও বিশ্রাম নেই। সুমনের চাচারা তখন তাদের সবকিছুর মালিক হয়ে গেছে। তাই সুমনের মাকে তাদের সংসারের সব কাজ করায় চাচীরা। যে ভাবীর সাথে ভাই এর সামনে শ্রদ্ধা করে কথা

বলতো, সেই ভাবীকেই এখন গালি দিতেও তাদের মুখে বাধে না। এসব প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই সুমন বড় হতে থাকলো। ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেলো। মাঝে মাঝে সুমনের চাচারা বলতো, পড়ালেখা কইরা তো আর জজ ব্যারিষ্টার অইবি না, তার চাইতে ক্ষেতে চল, কাম করতে। কিন্তু গ্রামের মানুষ সবাই যখন সুমনের প্রশংসা করতো তখন বাধ্য হয়েই তারা আর বন্ধ করতে পারেনি সুমনের লেখাপড়া। কিন্তু সুমনকে দিয়ের ঘরে বাইরে অনেক কাজ করাতো সময় পেলেই। চাচাতো ভাইবোনদেরকে পড়াতে হতো তার পড়ালেখার ফাঁকে।

দিনের শেষে রাত্রি পোহায়। সময় এগিয়ে যায় এভাবেই। ছোট্ট সুমন ম্যাট্রিক পাশ করে ফার্ষ্ট ডিভিশন পেয়ে। চাচারা তখন বলে, ভাই মরার পর তো আমরাই মানুষ করলাম পোলাডারে। দেখতে হইবোতো, কাগো ভাতিজা। এই বলে গর্ব করে হাসে। সুমন এর মায়ের চোখে খুশীর অশ্রু। কলেজে ভর্ত্তি হতে আর বাধা তাকে না সুমনের। গাঁয়ের অনেক বিত্তবান মানুষ এগিয়ে আসেন সাহায্যের জন্য। সে এখন ফার্ষ্ট ইয়ার এর ছাত্র। ষ্টুডেন্ট স্কলারাশিপ এর টাকা দিয়ে মাঝে মাঝে বোনের জন্য চুড়ি, চুলের ফিতা, মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনে আনে। মা আল্লাহ্‌র কাছে দুইহাত তুলে মোনাজাত করেন। এসব কথাই ভাবছিলো সুমন নদীর পাড়ে বসে। সন্ধ্যে গড়িয়ে যাচ্ছে। সুমন বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়। তার মনে এখন অনেক স্বপ্ন। ছোট্ট আয়েশাকে স্কুলে পড়াচ্ছে। সে একদিন চাকুরী করে মায়ের সব দুঃখ ঘোচাবে। এসব ভাবছিলো বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে। কিন্তু তার ভাবনায় ছেঁদ পড়লো বাড়ির একটু দুরেই গোপাল কাকার মুদি দোকানের সামনে এসে। সেখানে কয়েকজন খুব চিন্তিত হয়ে আলাপ করছিলো। গ্রামে নাকি মিলিটারি আসবে। সময় ১৯৭১। পয়লা মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেবার পর বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, তারপর ইয়াহিয়ার ঢাকায় আগমন, ব্যর্থ আলোচনা, ২৫ শে মার্চের নির্বিচারে গণহত্যা এসব খবর সবাই পেয়েছে। কিন্তু এতোদিন মিলিটারি আসার ভয় ছিলো না। কারণ শিমুলপুর গ্রামটা অনেক সুন্দর হলেও ঢাকা থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না। খুব দুর্গম পথ। সেই সাথে চারপাশে পানিবেষ্টিত হবার কারণে অনেকেই স্বস্থিতে ছিলো। কারণ পাক আর্মিরা নাকি পানিকে ভীষণ ভয় করে। কিন্তু আজকে শুনলো তারা আসছে। ছোট্ট গ্রাম। আস্তে আস্তে সবাই খবর পেয়ে গেলো। সবার চোখে মুখে শংকার ছায়া। সুমন বাড়ি ফিরতেই তার মা জড়িয়ে ধরে বললেন, বাবা, এই সব কি শুনতাছি। গেরামে নাকি মিলিটারী আইতাছে ? সুমন মাকে আশ্বস্ত করে। মা তুমি চিন্তা কইরো না। গেরামের সবাইতো আছে। আর আমরা তো কোন ক্ষতি করি নাই। আমাগোরে কিছু করবো না। মা কে এসব বললেও সুমন বুঝতে পারে তাদের সামনে অনেক বড় বিপদ। কারণ পাকিস্তানী আর্মিরা পশুর চেয়েও খারাপ। বিনা কারণে মানুষ মেরে তারা উল্লাস করে। এসব

চিন্তা করতে করতে সুমন ঘুমিয়ে পড়লো। সকালে বন্ধু জালাল এর ডাকে ঘুম ভাঙলো।
: সুমন, সব্বোনাশ হইয়া গেছে, মিলিটারী আইয়া পড়ছে। ইস্কুল ঘরে আস্তানা গাড়ছে। আর হরিপদ কাকা, তারা ভাই, ছলিম ব্যাপারী সহ আরো অনেকরে ধইরা নিয়া গেছে। এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলে জালাল হাঁপাতে থাকলো। ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই এমন একটা খবর শুনে সুমনের শংকা আরো বেড়ে গেলো। বললো, চল যাই, দেখি কি অবস্থা। স্কুল এর কাছে গিয়ে দেখে সত্যিই তাই। পাক আর্মিরা ক্যাম্প করেছে সেখানে। আর গ্রামের মাতব্বর খান সাহেব হাতে পাকিস্তানী পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন হাসিমুখে। সুমনদের বুঝতে বাকী রইলো না যে উনি দেশের শত্রুদের সাথে হাত মেলাতে যাচ্ছেন। এরপর ক'দিন ছিলো শিমুলপুর গ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে কষ্টকর অধ্যায়। বিনা কারণে মানুষ মারলো। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিলো। খাবার জন্য লুট করলো মানুষের গরু ছাগল। ওদের হাত থেকে নিরীহ গ্রামবাসী রেহাই পেলো না। কবিরাজ নিশানাথ, সবার প্রিয় হাফিজ স্যার, মুদি দোকানদার গোপাল, সাহসী তরুণ কামাল ভাই এর লাশ ভাসতে দেখা গেলো সোহাগী নদীর বুকে। সবার চোখ বেয়ে ভরা বর্ষার বাদলধারা। কেউ কেউ অস্ফুট স্বরে বলে উঠে, আহারে, আহারে। শুধু পাক আর্মি নয়, এদেশের কিছু মানুষও দেশের বিরোধী হয়ে কাজ করলো। তারা খবর দিতে থাকলো, কিভাবে, কোথায় অত্যাচার করা যাবে। সুমনের চাচা করিম শেখও নাম লেখালো রাজাকার বাহিনীতে। ঘরে তার কি হম্বি তম্বি। সুমনের মাকে বললেন, বুঝলা ভাবী, আমি আছি দেইখাই তোমাগো কোন চিন্তা নাই। আমারে মেজর সাব খুব পেয়ার করে। বলছে, তুম বহুত আচ্ছা আদমী। পান খাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে করিম শেখ। সুমনের গা জ্বলে যায় এই হাসি দেখে। মনে মনে শপথ নেয়, প্রয়োজনে দেশের জন্য অস্ত্র ধরবো আমি। ছিনিয়ে আনবো স্বাধীনতার লাল সূর্য।

একদিন অলস দুপুরে সুমন বসে বসে ভাবছিলো, কি করা যায়। এমন সময় তার বন্ধু কাঞ্চন ছুটে এসে বললো,
: দোস্তরে, একটা দারুণ খবর আছে।
: কি খবর?
কাঞ্চন গলাটা একটু খাদে নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললো। আমাগো গেরামে মুক্তিবাহিনী আইছে। সুমন প্রায় লাফিয়ে ওঠে একথা শুনে।
: সত্যি কইতাছোস ?
: হ। সত্যি। কিন্তু কাউরে কইবিনা। সুমনের বুকের মাঝে তেজোদীপ্ত আনন্দ ঘন্টা বাজতে থাকে। হ্যাঁ, এইতো সুযোগ। তাকে যেমন করেই হোক ঢুকতে হবে মুক্তিবাহিনীতে।

মুক্তিযোদ্ধাদের দলটা বেশী বড় নয়। জঙ্গলের গভীরে তাদের ঘাঁটি। দলনেতার নাম শরীফ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স এর ছাত্র। আরও আছে জামাল, সুব্রত, সোহেল,রেজা সহ সব মিলিয়ে ১১জন। সুমন, কাঞ্চন, জালাল, পরেশ গোল হয়ে বসে শরীফ ভাই এর মুখে শুনছিলো তাদের মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার কাহিনী। পঁচিশে মার্চের কালো রাতের পর তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত যায়। সেখানে ট্রেনিং নেয়। তারপর ছড়িয়ে পড়ে দেশের আনাচে কানাচে। বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন চালিয়ে গোপন খবর পেয়ে আজ তারা শিমুলপুরে। সুমন শোনে রোমাঞ্চিত হয়।

: শরীফ ভাই, আমিও যুদ্ধ করবো। আমাকেও সঙ্গে নেবেন, বলেন। সাথে সাথে সুমনের আরো বন্ধুরাও সমস্বরে বলে ওঠে, আমরাও, আমরাও। শরীফ ভাই শান্ত করেন সবাইকে। বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই করবে। তবে এখন প্রয়োজন তোমাদের সাহায্য। তোমরা আমাদেরকে খবরাখবর দিয়ে জানাবে পাক আর্মিদের গতিবিধি। সেই সাথে আমরা তোমাদের শেখাবো কি করে অস্ত্র ধরতে হয়, গ্রেনেড ছুড়তে হয়। এখন বাড়ি যাও। রাতে আবার দেখা করো। সুমনরা বাড়ি ফিরে উত্তেজনার সাথে।

বাড়ি ফেরার পর সুমনের অস্থিরতা দেখে মায়ের মনে সন্দেহ জাগে। বলে, বাবা তোরে এমন লাগতাছে ক্যান? সুমন মনের চঞ্চলতা গোপন করে বলে, কেমন লাগতাছে মা? আমি তো ঠিক আছি।

: বাবারে, মায়ের মন, সব বুঝে। খুইলা ক তো কি হইছে।

: আরে ধুর মা, তুমি খালি চিন্তা করো, কিছু অয় নাই।

: আইচ্ছা বাবা, শুনতাছি গেরামের পোলাপান যুদ্ধে যাইতে চায়। তুই ছাড়া আমার আর কেউ নাই। কথা দে, তুই যাবি না। তোর বাপ মরার পর থাইক্যা একটা আশায় আমি বাইচ্যা আছি। তুই বড় হইয়্যা মানুষ হবি। কত স্বপ্ন আমার। বলতে বলতে মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে থাকেন। সুমন মা'কে জড়িয়ে ধরে বলে, আরে মা তুমি চিন্তা কইরো না। এখন তাড়াতাড়ি ভাত বাড়ো, আমি গোছল কইরা আহি, খুব ক্ষিদা লাগছে। সুমনের মা একটু স্বস্থি বোধ করেন।

সন্ধ্যার পর থেকেই সুমন পায়চারি করতে থাকে। কখন মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে বের হওয়া যায়। রাতের খাবার পর মা শুয়ে পড়েন। সারাদিন এর হাড়ভাঙা খাটুনির পর ঘুম নেমে আসে তার দু'চোখে। সুমন আস্তে করে দরোজা খুলে বের হতে যায়। তখন ই শোনে বোন আয়েশার গলা, ভাইজান, এত রাইতে কই যাও? সুমন সব খুলে বলে তার ছোট্ট আদরের বোনটাকে। আয়েশা কথা দেয় সে কাউকে জানাবে না এই খবর। বের হয়ে পড়ে সুমন। রাত জাগা পাখির ডাক শোনা যায় দূরে কোথাও। বাঁশবন এ পাতা ঝরার শব্দ। কাঞ্চন এর বাড়ির কাছে গিয়ে সুমন অবিকল পাখির মত ডাক দেয়। কাঞ্চন এই ডাকের অপেক্ষাতেই

ছিলো। পরেশ আর জালাল ও বেরিয়ে আসে এভাবেই। জঙ্গলের মাঝে গিয়ে দেখে মুক্তিযোদ্ধারা খেতে বসেছে। সুমনদের খুব মায়া লাগলো। শুকনো চিড়া পানিতে ভিজিয়ে খাচ্ছে সবাই। সাথে একটু গুড়। শরীফ ভাই তাদেরকে দেখে হাসলেন। এত কষ্টের মাঝেও তার মুখের হাসিটা স্নিগ্ধ। সুমনের চোখে পড়ল মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রগুলো। উত্তেজনায় চকচক করে ওঠে তার চোখ। মনে মনে ভাবে, আহা আমিও যদি একটা রাইফেল পেতাম। শরীফ ভাই তার মনের কথা বুঝতে পারেন। তিনি বলেন, আগে তো শেখ, তারপর তোমরাও যুদ্ধ করবে দেশের হয়ে। এখন আমাকে জানাও পাক আর্মিরা কোথায়, কিভাবে আছে। সুমন কাগজ কলম চেয়ে নিলো। তারপর নিখুঁত ভাবে এঁকে দিলো একটা ম্যাপ। সবাই অবাক হলো ছোট্ট একটা ছেলের কাজ দেখে। সুমন বুঝিয়ে বললো, কোথায়, কিভাবে তারা আস্তানা গেড়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অস্ত্র যে ঘরে রাখা আছে সেই ঘর। ক'দিন আগে চাচার মুখে শুনেছিলো ক্লাস ফোর এর ঘরটাতে নাকি অনেক অস্ত্র। সুমন সেটাই বুঝিয়ে দিলো। শরীফ ভাই তারপর তাদের সামনেই সবার সাথে আলোচনায় বসলো। কয়েকদিন গতিবিধি লক্ষ্য করে তারপর চুড়ান্ত অপারেশন। পরদিন সকালে আসতে বলে বিদায় জানালো মুক্তিযোদ্ধারা।

বাড়ি ফিরে দরোজাটা লাগিয়ে সুমন শুতে যাবে, এমন সময় মা উঠে এলেন। সুমনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললেন, বাবা, আমারে সব খুইলা ক। সুমন বুঝতে পারলো মা'কে আর ফাঁকি দেয়া যাবে না। সব ঘটনা বললো সে। তারপর অনেক বুঝিয়ে রাজি করালো। মায়ের চোখের পানি ঝরতে থাকলো অবিরাম। সুমন বললো, মা স্বাধীন দেশের মানুষ হইয়া আমরা দেশটারে গড়বো। তুমি অমত কইরো না। মা বললেন, তোরে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করলাম। পরদিন সকালে সুমন তার বন্ধুদের নিয়ে শরীফ ভাই এর কাছে গেলো। যে যা পারে খাবার নিয়ে গেলো মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। অবাক হয়ে শুনলো এমনও সময় গিয়েছে যে তারা ১০/১২ দিন ভাত খায়নি। গ্রামের অবস্থান, কে কেমন মানুষ, রাজাকার হয়েছে কে কে সব খবর সুমন পরেশ জালাল আর কাঞ্চন জানালো মুক্তিযোদ্ধাদেরকে। তারপর সুমনদেরকে অস্ত্র দেখানো হলো। শরীফ ভাই বললেন, প্রথমে তোমাদেরকে গ্রেনেড ছোড়া শেখানো হবে। বলে তিনি সেফটি পিন খুলে দেখালেন কিভাবে গ্রেনেড ছুড়তে হয়। একে একে সুমনরা দেখলো, থ্রি নট থ্রি রাইফেল, ষ্টেনগান। এছাড়াও বিস্ফোরক তৈরীর জন্য প্লাষ্টিক এক্সপ্লোসিভ, ডিটেনেটর, ফিউজ, কর্ড। ঠিক করা হলো পরদিন রাতেই হামলা চালানো হবে আর্মি ক্যাম্পে। তবে সুমনকে দায়িত্ব দেয়া হলো তার রাজাকার চাচা করিম শেখের কাছ থেকে কৌশলে কিছু তথ্য জোগাড় করার।

বাড়ি ফিরে সুমন চাচার সাথে দেখা করলো। চাচার মিথ্যে প্রশংসা করে সুমন বললো, চাচা, আপনের সাথে তো খুব খাতির মেজর সাবের। আমারে একদিন নিয়া চলেন, উনারে

কাছে থেইক্যা দেহি। চাচা খুব খুশী হলেন। তিনি বিকেলে মেজর সাহেবের কাছে নিয়ে বাংলা আর উর্দু মিশিয়ে বললো, ইয়ে মেরা ভাতিজা হ্যায়, বহুত আচ্ছা লাড়কা, বহুত আচ্ছা ষ্টুডেন্ট। ম্যাট্রিক পাশ। মেজর সাহেব সুমনের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, তোমাদের দেশে কিছু দুষ্ট লোক ঝামেলা করছে। তুমি কি চাও না তাদেরকে শায়েস্তা করি? সুমন এমন ভাব করলো, সে যেন পাকিস্তানী সর্মথক। এই সুযোগে সে সব দেখে নিলো, কোথায় কি আছে। বাড়ী ফিরেই ছুট দিলো শরীফ ভাইয়ের কাছে। সব জানালো তাকে। তিনি বললেন ওয়েল ডান। আবার বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো সে। ফেরার পথে বন্ধুদেরকে সব জানালো। সবার চোখে মুখে দারুণ উত্তেজনা। রাতে বের হবার আগে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলো সুমন। কারণ আজ বিকেলেই সে ক্যাম্পে গিয়েছিলো। অপারেশন এর পর তার আর বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়। মা আর বোনের কাছ থেকে চোখের জলে বিদায় নিলো সাহসী ছেলে সুমন।

ঘড়ির কাটা রাত বারোটা। চুপিসারে মুক্তিযোদ্ধারা হাজির হলো স্কুলের পেছনে। দু'দিন এর শেখানো ট্রেনিং, মায়ের দোয়া আর বুক ভরা সাহস নিয়ে সুমন প্রথম গ্রেনেডটা চার্জ করলো। নিঁখুত নিশানা। একবারে অস্ত্র ভরা ঘরটার উপর পড়লো। প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো। তারপর এক এক করে আরও গ্রেনেড চার্জ করতে থাকলো কয়েকজন মিলে। দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো পুরো স্কুল। হঠাৎ এই হামলায় হতভম্ভ পাক আর্মিরা। পাহারা দিচ্ছিলো যে পাকসেনারা, তারা মারা গেলো মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে। বেশীরভাগ আর্মি মারা পড়লো বিস্ফোরণে। বাকীরা অস্ত্র সহ রেডী হয়ে আসতে না আসতেই আবারো হামলা চালালো মুক্তিবাহিনী। কিছুক্ষণ গুলি বিনিময় চললো। কিন্তু অকুতোভয়, দুর্দান্ত সাহসী বাংলার দামাল ছেলেদের হাতে পরাস্ত হলো বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিলিটারী ফোর্স। শিমুলপুর কে শত্রুমুক্ত করে উল্লাস শুরু করলো মুক্তিযোদ্ধারা।

কিন্তু উল্লাস দীর্ঘস্থায় হলো না। পরদিন আরও এক প-টুন সৈন্য এলো। এসেই অত্যাচার শুরু করলো। পরাজয়ের গ্লানি আর হিংস্রতা ওদের চোখে মুখে। আবার চললো তাদের নির্যাতন। বেশ ক'দিন চললো এই অবস্থা। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে আরও একদল মুক্তিযোদ্ধা যোগ দিলো আগের দলের সাথে। এই কদিনে সুমন বেশ সাহসী যোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সবাই তার প্রশংসা করে। প্রতিটি অপারেশনেই তার কৃতিত্ব অপরীসীম। সেই সাথে জালাল, কাঞ্চন আর পরেশ এর সাহসেরও প্রশংসা করে সবাই। এই চার কিশোর মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বের কথা সবার মুখে মুখে। শিমুলপুর যেন এক দুর্ভেদ্য এলাকা। পাক বাহিনীর মৃত্যুকুপ। এখানে পাক আর্মির যে দল ই আসে, নাকাল হয় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। তাই পাক বাহিনীর চাইলো আশে পাশের সব গ্রাম উজার করে দিতে। তারা হামলা চালাতে

থাকলো। পাশের গ্রাম রূপনগর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা সাহায্য চাইলো। সাহসী ছেলে সুমনকে দলনেতা করে ৯ জনের একটি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন শিমুলপুরের কমান্ডার শরীফ । রূপনগর যাবার আগে সুমন দেখা করতে এলো রাতের আঁধারে মায়ের সাথে। সুমনকে জড়িয়ে ধরে মায়ের সে কি কান্না। আবার গর্বে বুকটা ফুলেও উঠে চিন্তা করে, তার ছোট্ট সুমন আজ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ছোট বোন আয়েশা সুমনের রাইফেলটা নেড়ে চেড়ে দেখতে থাকে। সুমন বলে, মা হাতে বেশি সময় নাই কিন্তু। আমারে একটু পরেই দল নিয়া রূপনগর রওয়ানা হওন লাগবো। মা যত্ন করে ডিমের ঝোল রাধেন। গরম ভাতের সাথে মাখা মাখা করে রাধা ডিমের ঝোল যে তার সুমনের বড় প্রিয়। আয়েশাকে পাশে নিয়ে সুমন খেতে বসে। পরমাদরে বোনের মুখে তুলে দেয় ভাত। আর বলে, মারে দেইখা রাখিস আয়েশা। আর তোরা সাবধানে থাকবি। আমারে নিয়া চিন্তা করিস না। আমি ভালাই থাকুম তোগো দোয়াতে। তাড়াতাড়ি খেয়েই মা'কে জড়িয়ে ধরে আদর করে সুমন পা বাড়ায়। আজ তার জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই প্রথম দায়িত্ব পেয়েছে সে দলনেতা হয়ে। রূপনগরকে শত্রুমুক্ত করতে হবেই হবে।

রূপনগর এ গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দলটার কাছে জানতে পারে এখানকার পাকবাহিনীর অবস্থান। সুমন অবাক হয় ১১/১২ বছরের একটি ছোট্ট ছেলেকে দেখে। সে দলের ইনফর্মার এবং সেই সাথে সাহসী যোদ্ধা। আর্মিরা তার বাবা মা আর বৃদ্ধা দাদীকে মেরে ফেলার পর থেকে সে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথেই আছে। তার নাম শাহীন। সুমন খুব তারিফ করলো শাহীনের। তারপর বসলো আলোচনায়। তাদের কাছে কি পরিমান অস্ত্র এবং বিস্ফোরক আছে সব ব্যাপার এই আলাপ হলো। জানতে পারলো এর আগের কয়েকবার হামলা চালানো হয়েছে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুমুক্ত করতে পারে নি। তাদের দলের বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে। সুমন সবাইকে সাহস দিলো। তারাও ভরসা পেলো সুমনের কথায়। স্বাধীন দেশের স্বপ্ন সবার চোখে, বুকে দৃঢ় প্রত্যয়। রাতের বেলা সবাই গোল হয়ে কম ভলিয়্যুমে শুনতে বসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। শিল্পীদের গান, কবিতা তাদের প্রেরণা জোগায়। চরমপত্র শুনে তারা এত কষ্টের মাঝেও সব ব্যথা ভুলে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পরে। রাতে সবাই যখন ঘুমে, সুমন হারিকেন এর আলোয় লিখতে বসে। প্রতিদিন কি করলো সব লিখে রাখে ডায়েরীতে। সুমন ঠিক করেছে এই লেখা শেষ করবে স্বাধীন দেশে। একদিন হঠাৎ তার খুব ইচ্ছে করলো দেশকে নিয়ে একটি কবিতা লেখার। দেশ আর স্বাধীনতা, সব মিলিয়ে সে লিখতে বসলো। তার লেখার হাত খুব সাবলীল। বাংলার স্যার নরেন বাবু তার পরীক্ষার খাতায় রচনা দেখে বলতেন, বইয়ে আর কি লেখা আছে, তার চেয়ে সুমন যে সুন্দর কইরা বানায়া লেখে, আমি তো অবাক হইয়া যাই।

আজকে লিখতে বসে সেই কথা মনে পড়ে।

ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটা ছুঁই ছুঁই। আজকে অপারেশন। ২১ জনের একটি সাহসী মুক্তিযোদ্ধা দল এগিয়ে চলছে রূপনগরকে শত্রুমুক্ত করতে। তাদের দৃপ্ত পথচলায় বাজছে একটি গানের সুর। গানের নাম স্বাধীনতা। বুকের গহীন কোণে লালন করা এই স্বপ্ন সাহস দেয় এগিয়ে যাবার, আগামীর আহ্বানে। পাক বাহিনীর ঘাঁটির কাছে গিয়ে এ্যাম্বুশ করলো সবাই। সুমন চোখের ইশারায় সাহস দিলো। যার যার পজিশনে খুব সাবধানে থাকতে বললো। রহমান বিস্ফোরক তৈরী করে খুব দক্ষতার সাথে। সে *প্লাষ্টিক এক্সপ্লোসিভ*, ফিউজ আর কর্ড দিয়ে চমৎকারভাবে তার কাজ শেষ করলো। ঠিকভাবে বিস্ফোরিত হলেই তাদের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল। জালাল গ্রেনেড থ্রোয়ার দিয়ে প্রথম গ্রেনেডটা চার্জ করলো। সাথে সাথে চললো গুলিবর্ষণ। পাকবাহিনী মনে হয় প্রস্তুত ছিলো। তারাও পাল্টা হামলা করলো। কিন্তু সুমনের বুদ্ধিতে মুক্তিবাহিনী এইবার চমৎকার এক পরিকল্পনা করেছিলো। তাই আর্মিরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না কিভাবে কি করবে। একসময় তারা গুছিয়ে উঠলো অনেকটা। কিন্তু ততক্ষণে মুক্তিবাহিনী তাদের উদ্দেশ্যে অনেকটা সফল। পাকিস্তানী আর্মিরা প্রায় নাকাল তাদের হাতে। রহমান এর তৈরী করা বিস্ফোরক খুব কাজে দিয়েছে। এই সময় পাকবাহিনী মরণ কামড় দিলো। তারা সম্মুখ যুদ্ধ শুরু করলো। সুমনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা এখানেও সফল। একের পর এক পাকিস্তানী আর্মি মারা পড়ছে। আর মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাসে প্রকম্পিত রূপনগর । সুমন একাই কাভার করছে একটা দিক। এর ফলে অন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। আজ রূপনগর মুক্ত হবেই। সুমন ক্রলিং করে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলো। বিজয়ের সুবাতাস বইছে পোড়া বারুদের গন্ধে। আরও দু'জন মারা পড়লো সুমনের গুলিতে। শরীফ ভাই বলতেন, আহা, সুমনের হাত, একেবারে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মতো। কি নিখুঁত নিশানা। আজ সুমনের সেই সব কথা মনে পড়ছে। সফল অভিযান। অপারেশন প্রায় শেষ পর্যায়ে। ঠিক এই সময়। একটি গুলি। একটি গুলি শেষ করে দিলো মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাস । অসাধারণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকা সুমনের কপালে বিদ্ধ হলো ঘাতকের বুলেট। ততক্ষণে অন্য যোদ্ধারা এসে যোগ দিয়ে সুমনের সাথে। মারা পড়েছে প্রায় সব পাকিস্তানী সৈন্য। বাকীদের বন্দী করা হয়েছে। কিন্তু সুমনের কি হলো ? মায়ের আদর, বোনের ভালোবাসা, স্বাধীন দেশে বীরের বেশে ফেরার স্বপ্ন সব ই বুঝি হারিয়ে গেলো। সবার প্রিয় সুমন, যার যোগ্য নেতৃত্বে আজ রূপনগর শত্রমুক্ত, সেই সুমন আর নেই। প্রিয় বন্ধুর লাশের পাশে শোকে পাথর জালাল। রহমান এর চোখের কোণে অশ্রু নদীর বান। সজল, আলম, রতন কেউ ই আবেগ চেপে রাখতে পারছে না। মাত্র কয়দিনেই সবার খুব আপন হয়েছিলো দুরন্ত এই ছেলেটি। যে রূপনগরকে শত্রমুক্ত করলো সুমন, তার শীতল বুকেই হলো তার শেষ আশ্রয়। মায়ের মতো

প্রিয় মাটি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো পরম মমতায়।

ক্যাম্পে ফিরে জালাল কান্নায় ভেঙে পড়ে। সুমনের ব্যাগ খুলে কাপড়গুলো বুকে জড়িয়ে ধরে। বন্ধুর স্পর্শ পাবার চেষ্টাই মনে হয় করে জালাল তার ব্যবহৃত পোশাকে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে সুমনের ডায়েরী। পাতাগুলোতে চোখ বুলায় পরম মমতায়। অপারেশন এর আগের রাতের তারিখে জালাল দেখতে পেলো সুমনের শেষ লেখা। স্বরচিত একটি চমৎকার কবিতা। দুঃখ ব্যথা ভুলে জালাল বলিষ্ঠ কণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনায় সবাইকে "স্বাধীনতা" নামের সেই অমর কবিতাটি।

'তুমি আমার মায়ের মুখে মিষ্টি সুরের গান
তুমি প্রভাত পাখির কিচির মিচির কলতান
তুমি চাঁদের আলোয় ধোয়া পূর্ণিমা রাত
তুমি ঘাসফুলে শিশির সোনালী প্রভাত

তুমি আমার হারিয়ে যাওয়া সেই ছোট্টবেলা
দল বেধে সব বন্ধু মিলে কানামাছি খেলা
তুমি চেনা নদীর জলে ডুব সাঁতার কাটা
আঁকা বাঁকা ধুলো মাখা গাঁয়ের পথে হাঁটা

তুমি জীবন যুদ্ধে পাওয়া ঘাত প্রতিঘাত
হোচট খেয়ে পড়তে ধরা বিশ্বাসী হাত
তুমি আমার সব হারিয়ে আবার পাওয়া
কাঠফাটা রোদ্দুরের মাঝে শীতল হাওয়া'

আজ ১৬ই ডিসেম্বর। দেশ স্বাধীন হয়েছে। পাখির গান, ফুলের সুবাস, চারদিকে মানুষের বিজয় উল্লাস। কিন্তু সুমনের মায়ের মতো অনেকের মনে নেই আনন্দ, আয়েশার মতো অনেক বোন আজ ভাইহারা। স্বাধীনতা এসেছে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। বাংলার সবুজ মাটি রক্তে লাল হয়েছে। আমরা সবাই মিলে এই লাল সবুজ পতাকার সম্মান রাখবো। গড়ে তুলবো সুমনের সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ। আমাদেরকে পারতেই হবে। বিজয় দিবসে এই হোক প্রতিজ্ঞা সবার।

Alpo Kothar Golpo by Wasim Haque

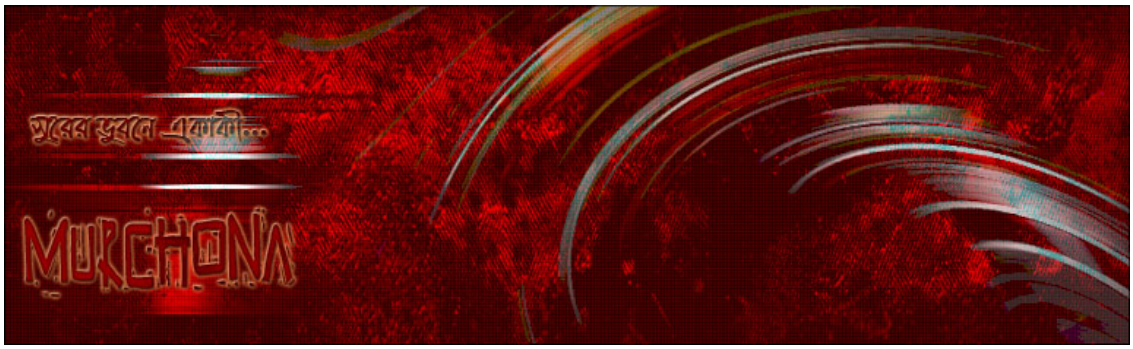

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.MurchOna.com/forum